দেশ কাল মানুষের আজ কাল পরশু

নাগরিক

প্রথম বর্ষ ❖ ২৬ তম সংখ্যা ❖ ২ এপ্রিল ২০২৫

➲এই সংখ্যায় থাকছে

- গাজা ''উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ'' ২
- সন্‌জীদা খাতুন ৪
- এলোমেলো কথা ইতিহাস মানে গল্পকথা নয় ৫
- ভারতের বিকল্প বাণিজ্য নীতির অন্বেষণ বিশেষ জরুরী ৫
- পরিবেশে দুর্বৃত্তায়ন ও আধিপত্যবাদ ৭
- গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্র : জন কল্যাণের একটু জরুরি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা ৯
- মার্কসীয় পরিবেশ ভাবনা এক দীপান্বিত অন্বেষা ১২
- গফুররা ফুলবেড়ের পথে : সেদিন ও আজ ১৪
- শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি ১৬
- স্মরণ : হরিমাধব মুখোপাধ্যায় ১৮
- কুমুদিনী হাজং ১৮
- স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ভূমিকা ১৯
- ঔরঙ্গজেবের সমাধি ধ্বংস করার চেষ্টা-- সঙ্ঘ পরিবারের অপদার্থতা ঢাকবার কৌশল ২১
- মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মহম্মদ ইউনূস ২৪
- বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস ২৪

➲সম্পাদকীয়

অনুপ্রবেশ নিয়ে প্রোপাগান্ডা

স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিতশাহ ২০২৬ সালে পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে পুনরায় 'অনুপ্রবেশ' নিয়ে প্রচার সুরু করেছেন। তিনি বলেছেন, পশ্চিমবঙ্গে যদি অনুপ্রবেশ বন্ধ করতে হয় তাহলে আগামী বিধানসভা নির্বাচনে ওই রাজ্যে তার দল বিজেপিকে জয়যুক্ত করতে হবে। তাঁরা ক্ষমতায় আসলে অনুপ্রবেশ বন্ধ হয়েযাবে। ২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের সময় নরেন্দ্র মোদি, অমিত শাহরা প্রচার করেছিলেন, তাঁরা ক্ষমতায় এলে ৩ কোটি উইপোকা/ ছারপোকা (পড়ুন বাংলাদেশী মুসলমান অনুপ্রবেশকারী) কে মেরে সীমান্ত পার করে দেবেন। বিভাজন সৃষ্টির জন্য এই ধরনের উগ্র সাম্প্রদায়িক প্রচার এদেশের কিছু মানুষ বিশ্বাস করেছেন। অথচ তাদের বক্তব্যের স্বপক্ষে মোদী -অমিত শাহরা আজ পর্যন্ত জনগণনা সংক্রান্ত কোনও কোনো তথ্য উপস্থিত করতে পারেননি। ২০২১ সালে সংসদে কোনও শ্বেতপত্রও প্রকাশ করেননি। গত জুলাই , ২০২৪ পর্যন্ত বাংলাদেশে শেখ হাসিনার সরকার ক্ষমতায় ছিল। ওই সরকারের সঙ্গে ভারতের যথেষ্ট সুসম্পর্ক ছিল। কিন্তু কোনও দিন কখনও নরেন্দ্র মোদি এই Issue নিয়ে তাঁর সরকারের বক্তব্য শেখ হাসিনাকে জানিয়ে ছিলেন কি ? জানান নি। তাঁরা বাইরে প্রোপাগান্ডা করে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করায় বিশ্বাসী।

কেনো মোদী সরকার জনগণনা করছেন না ? কত ঝড় জল গিয়েছে তাও ১৮৭২ সাল থেকে প্রতি ১০ বছর অন্তর জনগণনা হয়েছে। এই প্রথম জনগণনা হল না। কেনো ? বহু সঠিক সত্য সামনে চলে আসবে বলে ? অসম নিয়ে এত প্রোপাগান্ডার পর 'বিদেশী চিহ্নিতকরণ !' করতে গিয়ে কি পেলেন মোদী অমিতশাহ ? ২০০১ ও ২০১১ সালের জনগণনার রিপোর্টে দেখা যাচ্ছেওই ১০ বছরে পশ্চিমবঙ্গে জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছে ১৩.৮ % , সেখানে গুজরাটে, উত্তরপ্রদেশে ,বিহার , হরিয়ানা, মধ্যপ্রদেশে এই বৃদ্ধির হার যথাক্রমে ১৯. ৩ % , ২০.২%, ২৫.৪% , ১৯.৯% এবং ২০.৩%। গোটা হিন্দি বলয়ের প্রতিটি রাজ্যে ২০০১ থেকে ২০১১ সাল, এই দশ বছরে জনসংখ্যা বৃদ্ধির হার পশ্চিমবঙ্গ থেকে গড়ে শতকরা ১০% করে বেশি। কেনো ?

বাংলাদেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীরা কি হিন্দি বলয়ের রাজ্য গুলিতে গিয়ে ঢুকেছেন ?

মোদী --অমিত শাহরা কি বলবেন ?

সম্পাদক

শান্তনু দত্তচৌধুরী

সৌর বসু কর্তৃক সীমান্ত পল্লী, শান্তিনিকেতন, বীরভূম, পিন ৭৩১২৩৫ থেকে প্রকাশিত।

ই মেইল : nagorik0240@gmail.com ফোন : 80178 04019 / 94340 22512

গাজা ''উন্মত্ত জন্তুর মুখে জীবনের সোনার হরিণ''

মনিরুল হক

আধুনিক যুগের ভয়ঙ্করতম ঘটনা ছিল দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। একসময় সে যুদ্ধ শেষ হল। যুদ্ধের শেষে অনেকেই মনে করেছিলেন, পৃথিবী এবার শান্তি পাবে। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে শান্তি তো আসেই নি বরং যুদ্ধের পরেও বিশ্বজুড়ে নানাভাবে রোপন করা হয়েছিল অশান্তির বীজ। সেই সব বীজের একটা পোঁতা হয়েছিল প্যালেস্টাইনের মাটিতে। সেই বীজ থেকে জন্ম নিয়েছিল এক দৈত্যশিশু, যার তান্ডব আজ মানব সভ্যতাকে করে দিয়েছে উলঙ্গ, পড়ে আছে শুধুমাত্র তার কঙ্কাল।

আমরা আজ আলোচনা করতে চাইছি বিশ্বযুদ্ধ পূর্ববর্তী প্যালেস্টাইনের একটি অতি ছোট অংশ গাজা'র দুর্দশার কথা। দৈর্ঘ্য ৪১ কিলোমিটার আর প্রস্থে ৬-১২ কিলোমিটার একটি ভূখন্ডের ২০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৬০ হাজার জন নিহত হয়েছেন, ১ লক্ষ ১৩ হাজারের বেশি মানুষ গুরুতর আহত হয়েছেন যুদ্ধবাজ ইজরায়েলের নৃশংস আক্রমণে। আর কত হাজার মানুষ যে ধ্বংসস্তুপের তলায় চাপা পড়ে আছেন তার কোন হিসাবই নেই কারও কাছে। ভূমধ্যসাগরের তীরে কোলাহলমুখর এই প্রাচ্যভূমি তার বাড়িঘর, অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ-হাসপাতাল সহ সমস্ত স্থাপনা নিয়ে আজ এক আধুনিক ভগ্নস্তুপ। বোমা ও রকেট হামলায় বেঁচে যাওয়া মানুষজন শ্মশানভূমি থেকে পালিয়ে যাচ্ছেন, তারপর প্রভূর ইচ্ছায় ফিরে আসছেন শরণার্থী পরিচয়ে, তারপর আবার আক্রমণের মুখে পড়ছেন। আবার মৃত্যু, বাকিদের জন্য আবার নিরুদ্দেশ যাত্রা।

একটা তথ্য থেকেই বোঝা যাবে গাজার নীরস্ত্র জনতার উপর ইজরায়েলি আক্রমণের নৃশংসতার মাত্রা। ২০ বছর ধরে চলা ভিয়েতনাম যুদ্ধে মৃত্যু হয়েছিল ৭১ জন সাংবাদিকের আর গাজার এই ধ্বংসযজ্ঞে এর মধ্যেই মৃত্যু হয়েছে ২০০ -র মত সাংবাদিকের। বলতে দ্বিধা নেই, এর মধ্যে একটা বড় অংশকে টার্গেট করে খুন করেছে ইজরায়েল বাহিনী। তবে প্যালেস্টাইনে এই ধ্বংসযজ্ঞ, মৃত্যু আর নিরুদ্দেশ যাত্রা শুধু আজকের গল্প নয়, এর শুরু সেই ১৯৪৮ সালে যখন গায়ের জোর প্যালেস্টাইন ভূখন্ড দখল করে ইহুদি ধর্মাবলম্বীদের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হল নতুন রাষ্ট্র ইজরায়েল। এরপর নিজভূমে পরবাসী প্যালেস্টাইনবাসীরা নানান অহিংস ও সহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়ে গড়ে তুলেছিলেন তাঁদের নিজস্ব প্লাটফর্ম 'প্যালেস্টাইন লিবারেশন অর্গানাইজেশন' বা পি এল ও। পি এল ও-র ভিত্তি ছিল আরব জাতীয়তাবাদ ও ধর্মনিরপেক্ষতা। একদা গেরিলা যোদ্ধা ইয়াসের আরাফত বুঝেছিলেন শুধু সশস্ত্র লড়াই করে শক্তিশালী ইজরায়েলকে পরাজিত করা যাবে না। তিনি এগিয়ে এসে হাল ধরলেন পি এল ও'র। প্যালেস্টাইনের আদি বাসিন্দাদের জন্য স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের জন্য শুরু হল জন আন্দোলন। তখনকার সোভিয়েত ইউনিয়ন সহ সমাজতান্ত্রিক দুনিয়া, জোট নিরপেক্ষ দেশসমূহ সহ সমগ্র আফ্রিকা, দক্ষিন আমেরিকা এবং আরবভূমি সংহতি প্রকাশ করল প্যালেস্টাইনের প্রতি। কানাডা, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং পশ্চিম ইউরোপের মানুষও পথে নামল স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্রের পক্ষে। গড়ে উঠল বিশ্ব জনমত। জাতিসংঘের স্বীকৃতি পেল প্যালেস্টাইন। ১৯৭৪ সালে পেল জাতিসংঘের 'পর্যবেক্ষক' মর্যাদা। ১৯৯৩ এবং ১৯৯৫ সালে ইজরায়েল ও পি এলও'র মধ্যে দুই পরতে হল অসলো চুক্তি। ইজরায়েলও বাধ্য হল প্যালেস্টাইনকে স্বীকার করতে। অভ্যন্তরীণ রাজনীতিতে পূর্ণ স্বাধীনতা না পেলেও চিহ্নিত হল প্যালেস্টাইন ভূখন্ড। গঠিত হল প্যালেস্টাইন ন্যাশনাল অথরিটি, সংক্ষেপে পি এ। সীমিত অধিকার নিয়ে সেই প্যালেস্টাইন ভূখন্ডে চালু হল আংশিক স্বায়ত্বশাসন। ২০১২ সালে জাতিসংঘ প্যালেস্টাইনকে অ-সদস্য পর্যবেক্ষক রাষ্ট্র হিসাবে স্বীকৃতি দিল।

পি এ'র অধীনে স্বায়ত্বশাসন ছিল নিশ্চয় একটি অর্জন। কিন্তু মানুষ তো চায় ইজরায়েলের নাগপাশ থেকে মুক্তি। চায় পূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র। কিন্তু তার জন্য দরকার আবারও ব্যাপক জন আন্দোলন, শুধু পি এ এলাকায় নয়, সমগ্র ইজরায়েল জুড়ে, সারা পৃথিবী জুড়ে। পি এল ও সশস্ত্র লড়াইয়ের দিনেও, জনমত গঠনের জন্য নিজেদের প্রতিনিধি পাঠিয়ে ছিলেন পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে। মনে আছে, আমাদের রাজ্যে এসেও বিভিন্ন জায়গায় তাঁরা সভা করেছেন, মানুষকে জানিয়েছেন তাঁদের লড়াইয়ের কথা। আমরাও সমর্থন জানিয়েছি প্রাণভরে। কিন্তু জনমত গঠনের সেই ধারা পরে পরিত্যক্ত হল। পি এল ও কে গুরুত্বহীন করে তুলতে ১৯৮৭ সালেই প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল Harakah-al-Muqawamah al-Islamiyyah (HAMAS) যার অন্তর্নিহিত অর্থ ইসলামিক প্রতিরোধ আন্দোলন। ইসলামিক ব্রাদারহুডের আদর্শে গঠিত এই সংগঠনটির মূল উদ্দেশ্য ছিল ইজরায়েল সহ গোটা প্যালেস্টাইনে ইসলামিক শাসন কায়েম করা। স্বভাবতই এঁরা পি এল ও কে অগ্রাহ্য করেছেন, অসলো চুক্তিরও বিরোধিতা করেছেন। সেই জন্মলগ্ন থেকে এখনও জনমত গঠন নয়, অস্ত্রের যুদ্ধে ইজরায়েলকে পরাজিত করার সংকল্পে অটল আছে হামাস। প্রসঙ্গত বলে রাখি, অসলো চুক্তি ইজরায়েলের উগ্রপন্থীরাও প্রত্যাখ্যান করেছিল। চুক্তি সম্পাদন পর পরই এক জনসমাবেশে চুক্তি স্বাক্ষরকারী প্রধানমন্ত্রী ইজহাক রবিন এক কট্টর প্যালেস্টাইন বিরোধীর গুলিতে নিহত হন।

মনে রাখতে হবে অসলো চুক্তি একদিনে সম্পাদিত হয় নি। যুদ্ধক্লান্ত প্যালেস্টাইনবাসী মনে করেছিলেন ইজরায়েলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ এক অসম লড়াই। আবার ইজরায়েলের সাধারণ মানুষও সরকারের আগ্রাসন নীতির বিরোধিতায় প্রতিবাদ আন্দোলন সংগঠিত করেছেন। বিশ্ব জনমত ছিল সহবস্থানের পক্ষে। এসবের ফলশ্রুতিই হল অসলো চুক্তি। কিন্তু সহাবস্থান বা শান্তি কোনটাই পছন্দ নয় যুদ্ধবাজদের। আবার অপশাসন, মূল্যবৃদ্ধি, বেকারি, দুর্নীতি এসবের

বিরুদ্ধে আন্দোলনে দেশ যখন উত্তাল হয়ে ওঠে তখন শাসকের চোখে আলো দেখায় যুদ্ধ। বারবার হোঁচট খেতে খেতে বৃদ্ধ নেতানিয়াহুর উঠে দাঁড়ানোর একমাত্র অবলম্বন ছিল প্যালেস্টাইনের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধ। হামাস তাতে ঘৃতাহুতি দিয়েছে মাত্র।

পি এল ও র জনভিত্তি ছিল ব্যাপক। পি এ-র উপর ভিত্তি করে তা যাতে আরও প্রসারিত না হয় সে দিকে প্রখরদৃষ্টি রেখেছিল ইজরায়েল। তাদের কৌশলের অন্যতম বোড়ে ছিল হামাস। তারা তলে তলে হামাসের সঙ্গে সখ্যতা তৈরি করে পি এল ও কে কোনঠাসা করার জন্য। তারা প্রথম সাফল্য পায় ২০০৬ সালে। পি এ-র অধীনে স্বায়ত্বশাসনে থাকা গাজা অঞ্চলের নির্বাচনে হামাস জয়লাভ করে। এখন আর সরকারী বাহিনী নয়, হামাসই হয়ে উঠল পি এল ও-র প্রধান বিরোধী শক্তি। হামাসকে ঘুর পথে অর্থ যোগালো ইজরায়েল। তাদের অস্ত্রভান্ডার যে বাড়ছে সেটাও না দেখার ভান করল। বেন নেতানিয়াহু ২০১৯ সালে তাঁর দল লিকুদ পার্টির এক সভায় বলেন, "Anyone who wants to thwart the establishment of a palestinian state has to support and transferring money to hamas". আর নেতানিয়াহুর সঙ্গে কাজ করা একজন জেনারেল গেরশোন হাকোহেন নেতানিয়াহু সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন, "He is turning Hamas into his closest partner. Openly Hamas is an enemy-Covertly itós an ally". আর ইজরায়েলের পত্রিকা The Times of Israel মন্তব্য করেছে– "Israel has allowed suitcases holding millions Qatari cash to enter Gaza through its crossing since 2018".

আর হামাস?

তাঁরা লক্ষ্যে অবিচল। ২০২৩ সালের ৭ অক্টোবর তারিখে ইজরায়েলে ঝটিকা আক্রমণের পরে তাঁদের অবস্থান যা ছিল এখনও তাই আছে। তাঁরা মনে করেন ন্যায্য অধিকার আদায়ের জন্য তাঁরা লড়ছেন সঠিক পথে। জিহাদের পথই তাঁদের পথ। তাঁদের ভাষায়, "Jihad is its path and death for the sake of Allah is the liftiest of its wishes". ইজরায়েলকে পরাজিত করে স্বাধীন প্যালেস্টাইন গঠনের কমে অন্য কিছু তাঁরা মানবেন না। এই হল তাঁদের অবস্থান। ওঁদের অন্যম নেতা তাহের এল-নউনউ বলেছেন, "I hope that the state of war with Israel will become permanent on all the borders– and that the Arab World will stand with us". আর ইজরায়েলের সঙ্গে শান্তি আলোচনায় অংশগ্রহনকারী খলিল আল-হায়া আরও একধাপ এগিয়ে গিয়ে বলেছেন, "SIt was necessaryV To change the entire equation and not just have a clash. We succeeded in putting the palestinian issue back on the table and no one in the region is experiencing calm". অর্থাৎ যতক্ষণ না প্যালেস্টাইন সমস্যার সমাধান হচ্ছে ততক্ষণ এই অঞ্চলে কেউ শান্তিতে বসবাস করতে পারবেন না (অথবা আমরা কাউকে শান্তিতে বসবাস করতে দেব না)। আদতে হামাস একটি ইসলামিক সংগঠন যারা পরিস্কার জানিয়ে দিয়েছেন, "Secularism completely contradicts religious ideology. We are unable to exchange the present or future Islamic Palestine with the secular idea".

নেতানিয়াহু এবং হামাস, এই দু'পক্ষই এখনও শক্ত অবস্থানে আছে। অনেক টালবাহানার পর গত জানুয়ারী মাসে এক শান্তিচুক্তি সম্পাদিত হয়। সেটা ছিল শান্তিচুক্তির প্রথম ধাপ। কথা ছিল, শান্তিচুক্তি রূপায়িত হবে তিন ধাপে। প্রথম দুই ধাপে থাকবে অস্ত্র বিরতি, গাজার মানুষের পুনর্বাসন, বন্দী বিনিময়, শবদেহ বিনিময় ইত্যাদি। আর শেষ ধাপে আলোচনা হবে গাজা থেকে ইজরায়েলের প্রত্যাবর্তন এবং হামাসের নিরস্ত্রীকরণ বিষয়ে। বলা বাহুল্য, ওয়াকিবহাল মহলের কারও মনে হয় নি যে তৃতীয় ধাপ কার্যকর করা সম্ভব। কিন্তু তৃতীয় ধাপ তো দূর অস্ত, চুক্তির দ্বিতীয় ধাপের আলোচনাই ভেস্তে দিল ইজরায়েল, বন্দীমুক্তিতে হামাসের গড়িমসীর অজুহাতে। শুধু তাই নয়, বিধ্বস্ত অবস্থায় সবে ত্রাণ শিবিরে ফেরার মাত্র দুদিনের মধ্যেই শত শত শিশু-নারী-পুরুষকে খুন করে তারা আবার জাহির করল তাদের বীরত্ব!

ইজরায়েলে দেশের মধ্যেই যুদ্ধের বিরুদ্ধে ব্যাপক জনমত সংগঠিত হচ্ছে। সাধারণ মানুষ যুদ্ধ চাইছেন না। কিন্তু এই যুদ্ধ তো আসলে একতরফা আক্রমণ। এর বিরুদ্ধে গাজার সাধারণ মানুষ গত দেড় বছরে কোন প্রতিবাদ করার সুযোগই পান নি। দীর্ঘদিন ধরে তাঁরা অপমান, অমানবিকতা, ধ্বংস আর মৃত্যু সহ্য করে চলেছেন মুখ বন্ধ করে। এবার তাঁরাও মুখ খুলছেন, পরপর কয়েকদিন মিছিল করছেন এই নৃশংসতার বিরুদ্ধে। শ্লোগান দিয়েছেন হামাসের বিরুদ্ধেও। তাঁরা পরিস্কার বলছেন- যুদ্ধ বন্ধ করো। গাজাবাসীর কাছে এ বড় কঠিন সময়। তথাকথিত সভ্য মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের সরকারগুলি নির্লজ্জের মতো খুনি ইজরায়েলের পক্ষে দাঁড়িয়ে পড়েছে। দক্ষিণ আফ্রিকা, বলিভিয়া, বেলিজ, হন্ডুরাস, কলম্বিয়া, বাহারিন, চাঁদ, চিলি, নিকারাগুয়া দাঁড়িয়েছে ইজরায়েলের বিরুদ্ধে। এর বাইরে পৃথিবীর বাকি দেশগুলির সরকার প্রকৃতপক্ষে দর্শকের ভূমিকা পালন করছে। কিন্তু সাধারণ মানুষ স্বতস্ফূর্ত ভাবে পথে নেমেছেন। সারা পৃথিবীর কোটি কোটি মানুষ সংহতি জানিয়েছেন প্যালেস্টাইনবাসীর প্রতি। সমগ্র প্যালেস্টাইনের মানুষ আজ এক সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে আছেন। মানবিকতার লেশমাত্রের সন্ধানও তাঁরা পাচ্ছেন না কোথাও। এই জলজ্যান্ত মানুষগুলির বর্তমান বলে প্রায় কিছুই আর নেই। এক জান্তব জিঘাংসা তাঁদের অতীত ঐতিহ্যকে মুছে দিতে চায়, চায় তাঁদের জাতীয় অভিধান থেকে 'ভবিষ্যৎ' শধটিকেও চিরতরে মুছে দিতে।

কিন্তু আপাত প্রতিদ্বন্দ্বী দুই দল নেতানিয়াহু এ্যান্ড কোম্পানি এবং হামাস, কেউই শান্তি চায় না। ইজরায়েলের লক্ষ্য শুধু গাজা বা ওয়েস্ট ব্যাঙ্ক নয়, তারা চায় সিরিয়া, লেবানন ও জর্ডন, ইরাক ও মিশরের অংশবিশেষ নিয়ে এক বৃহত্তর ইজরায়েল রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠা আর হামাসের লক্ষ্য পূর্বে জর্ডন নদী থেকে পশ্চিমে ভূমধ্যসাগর পর্যন্ত ভূখন্ড নিয়ে স্বাধীন প্যালেস্টাইন রাষ্ট্র গড়ে তোলা। যুদ্ধ তাই চলতেই থাকবে। এদের একপক্ষ যদি হয় যুদ্ধপুঁজির দাস অপরপক্ষ সেক্ষেত্রে মধ্যযুগীয় ধর্মতন্ত্রের যোদ্ধা। উভয়েই আধুনিক, ধর্মনিরপেক্ষ, মানবিক সমাজের শত্রু। তাই লড়াইটা শুধু ইজরায়েল আর প্যালেস্টাইনের মধ্যে সীমাবদ্ধ নেই, তা হয়ে উঠেছে শোষন আর

পশ্চাৎপদতার বিরুদ্ধে, যুদ্ধের বীভৎসতার বিরুদ্ধে সচেতনতা আর স্বাধিকারের লড়াই, জান্তব হিংস্রতার বিরুদ্ধে মানুষের সভ্যতার লড়াই। আমরা চাইব, যৌথভাবে এই লড়াইয়ের নেতৃত্ব দিক ইজরায়েল ও প্যালেস্টাইনের ভুক্তভোগী সাধারণ মানুষ। বাকি পৃথিবীর সাধারণ মানুষ তো তাঁদের সঙ্গেই থাকবেন।

সন্‌জীদা খাতুন
(১৯৩৩-২০২৫)

নিজস্ব প্রতিনিধি : বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, সংগীতজ্ঞ, ছায়ানটের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা ও সভাপতি সন্‌জীদা খাতুন আরনেই। গত ২৫ মার্চসকালে তিনিশেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। দীর্ঘদিন ধরে সন্‌জীদা খাতুন ডায়াবেটিস, নিউমোনিয়া এবং কিডনি রোগে ভুগছিলেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৯২ ছুঁই ছুঁই।

সন্‌জীদা খাতুনের বিপুল কর্মময. বর্ণাঢ্য জীবন সামগ্রিকভাবে বাঙালির মানস ও সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। সন্‌জীদা খাতুনেরজন্ম ১৯৩৩ সালের ৪ এপ্রিল। তাঁর বাবা কাজী মোতাহার হোসেন ছিলেন জাতীয় অধ্যাপক। মা সাজেদা খাতুন গৃহিণী। সন্‌জীদা খাতুনঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়থেকে ১৯৫৪ সালেবাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক, ১৯৫৫ সালে ভারতের বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর এবং ১৯৭৮ সালে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। শিক্ষকতা দিয়েই তাঁর কর্মজীবন শুরু। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে দীর্ঘকাল অধ্যাপনা করেছেন তিনি।

সন্‌জীদা খাতুন আজীবন ছিলেনযেকোনো অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী মুখ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী হিসেবে বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই সন্‌জীদা খাতুনসক্রিয়হয়ে উঠেছিলেন। দেশের সব ধরনের সংকটে সোচ্চার ছিলেন এই বরেণ্য ব্যক্তিত্ব। কবি শঙ্খ ঘোষ তাঁর সম্পর্কে লিখেছিলেন, ‘‘গান তাঁর জীবিকা নয়, গান তাঁর জীবন, চারপাশের মানুষজনের সঙ্গে মিশে যাওয়া এক জীবন। ধর্মতলা স্ট্রিটের প্রথম পরিচয়ে জেনেছিলাম যে দেশের আত্মপরিচয় খুঁজছেন তিনি রবীন্দ্রনাথের গানে, আর আজ জানি যে সে-গানে তিনি খুঁজে বেড়াচ্ছেন নিজেরই আত্মপরিচয়।’’ ২০২১ সালে ভারত সরকার তাঁকে পদ্মশ্রী সম্মানে ভূষিত করে। পেয়েছেন এ পার বাংলা থেকে রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার, দেশিকোত্তম সম্মান। লিখেছেন রবীন্দ্রনাথ ও আত্মস্মৃতি বিষয়ক বেশ কিছু গ্রন্থও।

শিল্পী কামরুল হাসানের নেতৃত্বে সন্‌জীদা খাতুন ব্রতচারী আন্দোলনে যোগ দেন। তাঁর প্রথম গানের গুরু ছিলেন সোহরাব হোসেন। তাঁর কাছে তিনি দীক্ষা নেন নজরুলসংগীত, আধুনিক বাংলা গান ও পল্লিগীতির। প্রথমে রবীন্দ্রসংগীত শিখেছেন প্রখ্যাত হুসনে বানু খানমের কাছে। এরপর তিনি শৈলজারঞ্জন মজুমদার, আবদুল আহাদ, কণিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, নীলিমা সেনদের মতো বিখ্যাত রবীন্দ্রসংগীত শিল্পীদের কাছ থেকে তালিম নেন।

চোখে অশ্রু, হাতে ফুল নিয়ে সন্‌জীদা খাতুনের শেষ বিদায়ে ছায়ানট সংস্কৃতি ভবনে হাজারো মানুষের ঢল নেমেছিল। শাহীন সামাদ, বুলবুল ইসলামরা গাইলেন,‘তুমি যে সুরের আগুন লাগিয়ে দিলে মোর প্রাণে’, ‘কান্না হাসির দোল দোলানো’। ২৬ মার্চ দুপুরে বাংলাদেশের সংস্কৃতি অঙ্গনের অগ্রণী ব্যক্তিত্ব, সংগীতজ্ঞ সন্‌জীদা খাতুনেরকফিনশেষবারেরমতো ছায়ানট সংস্কৃতি-ভবনে নেওয়া হলেশোকের আবহ তৈরি হয়। গান আর ফুলের শ্রদ্ধা ও ভালোবাসায় শেষ বিদায় জানালেন সংস্কৃতিকর্মী, সাংবাদিক, শিল্পী, ছায়ানটের শিক্ষক, শিক্ষার্থী, কর্মীসহ হাজার মানুষ।

সুষুপ্ত পাঠকের সংযোজন

এটা ছিল ষাটের দশকের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক চেতনা ও বাঙালির শেকড়ে ফেরার সাংস্কৃতিক প্রদীপের শেষ আলোক শিখা। তিনি সনজীদা খাতুন। তাঁর মৃত্যুর মধ্য দিয়ে আমার কেন যেন মনে হলো এই শেষ আলোক শিখাটি যেন একটা দাবানলের জন্য আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে গেলেন...।

তাঁর শেষকৃত্য হলো রবীন্দ্র সংগীতের মাধ্যমে। তাঁর দেহ তিনি দান করে গেছেন মানুষের কল্যাণে। এমন শেষকৃত্য একটা জেনারেশনকে মন্ত্রের মত অনুপ্রেরণা দিবে। শহীদ মিনারে ফুল দেয়া, প্রভাত ফেরি হারাম, হিন্দুদের কাজ; মুসলিম চেতনার সাংস্কৃতিক এই অপপ্রচার ব্যর্থ করে ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক প্রজ্ঞাবানরা প্রদীপ জ্বালিয়ে, উত্তরীয় পরে, আলপনা এঁকে গানে গানে নববর্ষকে ডেকে যে ‘হিন্দুয়ানী সংস্কৃতির’ উত্তরাধিকার বুঝে নিলেন, হাজার আহমদ ছফার ‘বাঙালি মুসলমানের নিজস্বতা’ নামের কাল্পনিক সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ডাক মুখ থুবড়ে পড়েছিল। এতটাই শক্তিমান সনজীদা খাতুনরা ছিলেন যে মুফতি হান্নানরা জানতেন লাখ লাখ মাদ্রাসার ক্ষমতা নেই ছায়ানটের রমনার বটমূলে প্রভাতের ‘এসো হে বৈশাখ’ যে শক্তি রাখে তাকে পরাজিত করতে। ঢাকার এই আলতা পায়ের আলপনা আঁকা রবীন্দ্র জয়ন্তী আর প্রদীপ জ্বেলে দিবস বরণ করা সাংস্কৃতিক ছোট্ট গোষ্ঠিটি যখন পথে নামে তখনই ইতিহাস বদল হয়। এই অপরিসীম ক্ষমতার কথা আমরা জানতান না, জানত প্রতিক্রিয়াশীল শক্তি।

তাই ২৪-এর আন্দোলনের শুরু ছিল ষাটের দশকের সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার সেজে। দেশের গান, জাতীয় সংগীত, মুক্তিযুদ্ধের গান, ছেলেমেয়েদের মিলিত কণ্ঠে দ্রোহের গান; এইসব ‘অনৈসলামিক’ সংস্কৃতিবান সেজে পথে নামিয়েছিল ঢাকার ছোট্ট সাংস্কৃতিক নাগরিকদের। প্রতারণা সফল হয়েছে সত্য। কিন্তু বারে বারে ঘুঘু তুমি খেয়ে যাবে ধান; তাতো হয় না। সনজীদা খাতুনের দেহদান, তার রবীন্দ্র সংগীতে শেষকৃত্য; ঢাকার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক শক্তিতে রূপ

নিবে। এমন মহান মৃত্যু আর তাঁর পরলৌকিক রাবীন্দ্রিক বিদায় আবার স্বপ্ন দেখাচ্ছে। আমি নিশ্চিত। এই যাত্রা তিমিরনাশী। আলো জ্বালতে আগুনের ফুলকি ছড়িয়ে পঞ্চভূতে তিনি বিলিন হয়েছেন। বিদায়...।
(সুযুপ্ত পাঠকের লেখাটি তাঁর ফেসবুক পাতা থেকে নেওয়া)

এলোমেলো কথা

ইতিহাস মানে গল্পকথা নয়

শুভ বসু

আজকের ' ফেসবুক ' ইসলামের ইতিহাসের পাঠের ব্যাখ্যাতে ভরে গেছে। তাঁদের অধিকাংশ লেখা বাংলাদেশের বাঙালিদের। ইসলাম আমার ধর্ম নয়, কিন্তু সেই ধর্মের ইতিহাসের সম্পর্কে সামান্য জ্ঞান রয়েছে। তাই মনে হয় আমার চাইতেও অল্প জ্ঞান নিয়ে কেন মানুষ ফেসবুকে লেখে আর তান্ডব চালায় । যেমন ধরুন একটি শধ বহুল প্রচলিত আজকের বাংলাদেশে 'তৌহিদী জনতা'। ইসলাম ধর্মে যাঁরা বিশ্বাস করেন তাঁরা সকলেই তৌহিদের ধারণায় বিশ্বাস করেন। কাজেই কাউকে বিশেষ করে তৌহিদী জনতা নাম নিয়ে কাজ কারবার করার দরকার পরে না। আসলে মব ভায়োলেন্স কে জায়েজ করার জন্যে এই সব নামের উৎপত্তি।

ইতিহাসে জর্জ রুড বলে এক ঐতিহাসিক ১৯৫৯ সালে ' দি ক্রাউড ইন দি ফ্রেঞ্চ রেভলিউশন ' বলে এক বইতে ' মব ' এবং ' ক্রাউড ' এর মধ্যে একটি পার্থক্য করেন। মব মূলত নেতিবাচক অর্থে ব্যবহৃত হয় উচ্ছৃঙ্খল হিংশ্র এবং ধ্বংসাত্মক শধ হলো ' মব '। রুড ফরাসি বিপ্লব কে বিশ্লেষণ করতে গিয়ে ক্রাউড শধ ব্যবহার করেন।' ক্রাউড ' কে তিনি বলেন একটি সংঘবদ্ধ সুসংহত জনগণ, যাঁরা একটি বিশেষ লক্ষে আন্দোলন পরিচালনা করেন। বাংলায় যাকে গণ আন্দোলন বলে অভিহিত করা যায়।

তবে ইতিহাসের যথেচ্ছ প্রয়োগ শুধু মুসলমান তোহিদি জনতার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। ভারতেও হিন্দুত্ববাদীরা দুদিন আগে পর্যন্ত যে বিকৃত ইতিহাস পরিবেশনা করতো তা নিয়ে প্রতিবাদ করলে আমাদের পিছনে লেগে যেত। আওয়ামী লীগ বাংলাদেশের ইতিহাসের ঠিকাদারি নিয়েছিল এবং তাঁদের একটি অংশ আমার একান্ত সাধারণ বই 'ইন্টিমেশন অফ রেভোলুশনে' কেন বঙ্গবন্ধু নেই বলে সমালোচনা শুরু করেন। আজকে ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল মিডিয়া তে যে ইতিহাস সম্পর্কে তথ্য দেন তাতে আমার ভিরমি খাবার জোগাড় হয়।

আসলে মানুষ ইতিহাসকে গল্প কাহিনী মনে করে। কিন্তু ঐতিহাসিক নথি দেখে, সেই নথির তথ্য বিশ্লেষণ করে সেই নথির উপর প্রশ্ন করে তার সঙ্গে আর পাঁচটা নথি এবং লোক কাহিনীর সঙ্গে তুলনা করে সেই সময়কার ভৌত সংস্কৃতি বা মেটেরিয়াল কালচারের উপাদান সংগ্রহ করে তার ভিত্তিতে ইতিহাস রচনা করেন। কিন্তু ইতিহাসের তো কোনো মূল সত্য নেই। একটি ঘটনার নানাবিধ আপেক্ষিক বিশ্লেষণ রয়েছে। তবে আমার কাছে মনে হয় ইতিহাসের সামগ্রিক বিশ্লেষণ এর একটি প্রয়াস রাজনৈতিক ইতিহাসের বাইরে গিয়ে এম্মানুয়েল লাদুরির মতো ঐতিহাসিকরা করেন। লাদুরি ফ্রান্সের একটি অঞ্চলের আর্থ-সামাজিক এবং পরিবেশের ইতিহাস রচনা করেন একটি গ্রামের সমাজের উপর ভিত্তি করে। আবার কার্লো গিঞ্জবার্গ ১৯৭৬ সালে ইতালির ডোমেনিকো স্ক্যান্ডেলা বলে এক গম পেশনকারীর জীবনের ইতিহাস সংগ্রহ করে সেই সময়কার ধর্ম সমাজ এবং সংস্কৃতি সম্পর্কে লেখেন।

আমাদের ভারতে শহীদ আমিন সাহেব একটি অনবদ্য ইতিহাস রচনা করেন ' ইভেন্ট , মেটাফোর, মেমোরি চৌরি চৌরা , ১৯২২--১৯৯২।' গান্ধিজি তাঁর সত্যাগ্রহ ১৯২২ সালে প্রত্যাহার করে নেন চৌরিচৌরার হিংস্র ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে। শহীদ আমিন সেই ঘটনার সূত্র ধরে এক অপূর্ব গ্রন্থ রচনা করেন। কিন্তু ইতিহাসের বিশ্ববিদ্যালয়ে পঠন এবং জনপ্রিয় ইতিহাসের কাহিনীর মধ্যে এমন তফাৎ হয় যে ইতিহাস রচনা এক অদ্ভুত মোর নেয় তথ্যের বিকৃতির। যেমন উপনিবেশিক ভারতের ইতিহাসের দুটি গ্রন্থ দু ভাবে ইতিহাস কে প্রভাবিত করে। একটি ধরুন জেমস টড এর ' এনালস এন্ড আন্টিকুইটিস অফ রাজপুতানা। 'তার প্রভাব ভারতের ইতিহাস রচনায় গভীর।

কিন্তু সেই ইতিহাস যে উচ্চবর্ণের রাজপুতদের লোককাহিনী মাত্র সেটা আর ভারতীয় লেখকদের মনে স্থান পায় না। এমন কি অবন ঠাকুরের মত সংবেদনশীল লেখক ও ' রাজকাহিনী 'লিখে ফেললেন মূলত টড এর রাজপূত কাহিনী অবলম্বনে। আবার W W Hunter ' এনালস অফ রুরাল বেঙ্গল ' এ লেখেন বীরভূম জেলার কৃষি এবং শিল্পের এক অনবদ্য ইতিহাস। কিন্তু সেই ইতিহাস উপেক্ষিত। আসলে আমরা ধর্ম , সংস্কৃতি , রাজনীতির একটি অতি সরলীকৃত ব্যাখ্যায় বিশ্বাস করি। সেই ব্যাখ্যার ভিত্তিতে উত্তেজিত হই এবং সিদ্ধান্তে উপনীত হই। ইতিহাসের কোনো স্থান নেই বর্তমান পৃথিবীতে।
(লেখক কানাডার ম্যাকগিল বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসের অধ্যাপক)

ভারতের বিকল্প বাণিজ্য নীতির অন্বেষণ বিশেষ জরুরী

সৌর বসু

ডোনাল্ড ট্রাম্প মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর যে সমস্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন তা নিয়ে সমগ্র বিশ্ব জুড়ে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রতিবেশী রাষ্ট্র কানাডা এবং মেক্সিকো ইউরোপের ফ্রান্স জার্মানি ইংল্যান্ড প্রমুখ ক্ষমতাশালী রাষ্ট্রগুলি এবং

রাশিয়া, চিন সহ ব্রিক গোষ্ঠীর রাষ্ট্রগুলি, ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপর বিষোদগার করছে। পারস্পরিক সহযোগিতা পূর্ণ মনোভাব নিয়ে পথ চলার তিনি বিরোধী। মানব সভ্যতার সামনে এখন সবথেকে বড় সংকট জলবায়ু পরিবর্তন। এই সংকটকে মোকাবিলা করার জন্য বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে পারস্পরিক সহযোগিতার বিশেষ প্রয়োজন। সেই কারণে প্যারিস শহরে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এই সংকটের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য কিছু শর্তাবলী সেখানে নির্দিষ্ট করা হয়। ডোনাল্ড ট্রাম্প বিশ্বাস করেন না যে জলবায়ু পরিবর্তন একটি বড় সংকট রূপে পৃথিবীর সামনে দেখা দিয়েছে। সে কারণে তিনি প্যারিসে স্বাক্ষরিত চুক্তি থেকে আমেরিকার নাম তুলে নিয়েছেন।

ডোনাল্ড ট্রাম্প 'একলা চলো'. নীতিতে বিশ্বাস করেন। সে কারণে তিনি তাবৎ রাষ্ট্রকে তার পদানত রাখতে চান। পৃথিবীর বিভিন্ন রাষ্ট্রের বিরুদ্ধাচারণ করে আমেরিকার মাথায় শ্রেষ্ঠত্বের শিরোপা তুলে দেওয়া কি সম্ভব! আমেরিকার বাণিজ্য নীতি এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের মুখোমুখি। দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের পর থেকে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমেরিকার যে সমৃদ্ধি তা সম্ভব হয়েছে অনেকাংশে মুক্ত বাণিজ্যের উপর নির্ভর করে। ক্ষমতায় এসে সেই মুক্ত বাণিজ্যের উপর ট্রাম্প শুল্কের প্রাচীর চাপিয়ে দিতে চাইছেন। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের চিরাচরিত বাণিজ্য নীতি আজ ভাঙ্গনের মুখে। এর পরিণাম কি ভবিষ্যৎ বলবে।

শুল্ক নীতি নিয়ে আমেরিকার সঙ্গে বিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্রের মধ্যে লড়াই চলছে ।মার্কিন রাষ্ট্রপতি ডোনাল্ড ট্রাম্প একতরফাভাবে আমেরিকাতে আমদানিকৃত বিভিন্ন পণ্যের উপর উচ্চ হারে শুল্ক চাপাবার কথা ঘোষণা করেছেন। পারস্পরিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে, আলোচনার মাধ্যমে শুল্ক আরোপের বিষয়টির নিষ্পত্তি হয়ে থাকে। কিন্তু ডোনাল্ড ট্রাম্প দ্বিতীয় দফায় ক্ষমতায় আসার পর একতরফাভাবে শুল্ক নীতির হার বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করছেন। তিনি কোনও আন্তর্জাতিক আইনের তোয়াক্কা করছেন না । নিজেদের দেশের রাজনীতিবিদ, অর্থশাস্ত্রীদের পরামর্শ কানে নিচ্ছেন না। তার দোসর হয়ে উঠেছে এলান মাস্ক সহ আমেরিকার ধনী সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিবৃন্দ। বোধ করি তাদের স্বার্থ রক্ষার প্রতি তিনি যতটা দায়বদ্ধ, আমেরিকা বাসীর প্রতি ততটা নন। ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে ঘনিষ্ঠ মিত্র আখ্যা দিয়ে ভারতের শুল্কনীতির তুলোধোনা করেছেন ।

ট্রাম্পের এই দাদাগিরির কড়া জবাব মেক্সিকো কানাডা জার্মানি ফ্রান্স সহ বিভিন্ন উন্নত রাষ্ট্রের প্রধানেরা দিয়েছেন। ট্রাম্পের হুমকিকে চীন পাত্তা দিচ্ছে না। পালটা আঘাত হেনে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী বলেছেন, উপযুক্ত জবাব দেবে। আমেরিকা, চীনের আমদানিকৃত পণ্যের উপর অতিরিক্ত পনেরো শতাংশ শুল্ক আরোপ করলে চিন আমেরিকার পণ্যের উপর ১৫ শতাংশ শুল্ক বৃদ্ধি করার কথা ঘোষণা করেছে। ফ্রান্সের রাষ্ট্রপতি ট্রাম্পের সঙ্গে আলোচনার সময় তাকে থামিয়ে দিয়ে ট্রাম্পের ভুল সংশোধন করে দিয়েছেন। কানাডার পররাষ্ট্রমন্ত্রী ব্যাঙ্গক্তি করে বলেছেন ট্রাম্প শুল্ক নিয়ে সাইকো ড্রামা করছেন । কানাডা তার জবাব দিতে প্রস্তুত আছে। বিভিন্ন দেশের রাষ্ট্রপ্রধানরা ডোনাল্ড ট্রাম্পের এই একতরফা দাদাগিরির জবাব দিলেও, নীরবতা পালন করছে ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। ট্রাম্প তার মিত্র নরেন্দ্র মোদিকে পাশে বসিয়ে ভারতের সমালোচনা করে বলেছেন আমেরিকার পণ্যের উপর ভারত সর্বোচ্চ হারে শুল্ক স্থাপন করেছে। নরেন্দ্র মোদির পক্ষ থেকে এর কোন প্রতিবাদ শোনাই যায়নি। উপরন্তু উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন মোটরসাইকেল, ইলেকট্রনিক যানবাহনের উপর থেকে শুল্ক কমিয়ে দিয়েছেন রাশিয়া থেকে তেল আমদানি কমিয়ে, আমেরিকা থেকে তেল আমদানির পরিমাণ বৃদ্ধির কথা ঘোষণা করেছেন। তাবড় দুনিয়ার রাষ্ট্রপ্রধানরা যেখানে ট্রাম্পের শুল্ক নীতির বিরুদ্ধে খড়গহস্ত, আমাদের প্রধানমন্ত্রী ডোনাল্ড ট্রাম্পের ঘনিষ্ঠ মিত্র মোদিজি সেখানে ট্রাম্প ও তার প্রশাসনকে খুশি করার জন্য শুল্ক হ্রাস করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ভারত যে পণ্য রপ্তানি করে তার অন্যতম হলো ইলেকট্রনিক পণ্য, রত্ন ও গয়না, ওষুধজাত পণ্য, অপরিশোধিত তেল ,পেট্রোলিয়াম প্রভৃতি। ২০২৪ সালে ভারতের, মার্কিন দেশে পণ্য রপ্তানির পরিমাণ ৭৭.৫ বিলিয়ন মার্কিন ডলার এবং আমেরিকা থেকে ভারত আমদানি করেছে ৪০.৭ মার্কিন ডলার মূল্যের পণ্য। অর্থাৎ ভারতের মার্কিন দেশের সঙ্গে বাণিজ্য উদবৃত্ত ছিল ৩০.৮ বিলিয়ন ডলার। ভারত ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে ৫৭৪৯ টি পণ্য আমদানি করেছে এর মধ্যে অন্যতম তেল এবং খনিজ জ্বালানি, পারমাণবিক চুল্লি, বৈদ্যুতিক যন্ত্র, বয়লার, মুক্তসহ মূল্যবান পাথর প্রভৃতি। ভারত থেকে ২০২৪ সালে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের রপ্তানি কৃত পণ্যের মধ্যে অন্যতম ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্য, ইলেকট্রনিক পণ্য, রত্ন অলংকার ,ওষুধের ফর্মুলেশন প্রভৃতি। এর মধ্যে ইঞ্জিনিয়ারিং পণ্যের রপ্তানি মূল্য ১৭.৬ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, ইলেকট্রনিক পণ্যের ১০ বিলিয়ন মার্কিন ডলার। রত্ন অলংকার ওষুধের ফর্মুলেশন এবং পেট্রোলিয়াম পণ্য যথাক্রমে ৯.৯০ বিলিয়ন ৮.৭২ বিলিয়ন ও ৫.৮৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার।

উপরের পরিসংখ্যান থেকে দেখা যাচ্ছে যে আমেরিকার সঙ্গে বাণিজ্যিক ক্ষেত্রে ভারতের বাণিজ্যিক উদ্বৃত্ত রয়েছে। ডোনাল্ড ট্রাম্প যেন তেন প্রকারেন এই বাণিজ্যিক ঘাটতি মিটিয়ে ফেলতে চাইছেন। সেই উদ্দেশ্যে তিনি বিভিন্ন সভায় এবং মার্কিন কংগ্রেসের উভয় কক্ষে ভারতের শুল্কনীতির কড়া সমালোচনা করে চলেছেন। বস্তুত পক্ষে আমেরিকা আমদানিকৃত পণ্যের উপর অনেকাংশে নির্ভরশীল। কারণ আমেরিকাতে বিভিন্ন পণ্য উৎপাদন করতে গেলে যে খরচ পড়বে, আমদানিকৃত পণ্যের মূল্য সেই তুলনায় কম। কারণ আমেরিকায় শ্রম মূল্য (labour cost) অত্যধিক।

ডোনাল্ড ট্রাম্প ক্ষমতায় আসার পর ভারতের বিদেশ মন্ত্রী ঘনঘন আমেরিকায় যাতায়াত করছেন। বাণিজ্য মন্ত্রী পীযূষ গোয়েল আমেরিকায় এক সপ্তাহ কাটিয়ে এলেন। আমেরিকার সরকারের সঙ্গে ভারতের বানিজ্য সংক্রান্ত কি আলোচনা হয়েছে সে সম্পর্কে বিদেশ

মন্ত্রণালয় বা বাণিজ্যিক মন্ত্রণালয় টুঁ শব্দটি করছেন না। স্বাধীন সার্বভৌম দেশের নাগরিক হিসেবে ভারতের জনগণের তা জানার অধিকার রয়েছে। নরেন্দ্র মোদির সরকার দেশের মানুষকে অন্ধকারে রেখেছেন। ভারতের বাণিজ্য সচিব এ বিষয়ে জানিয়েছেন বাণিজ্য সংক্রান্ত আলোচনা সম্পূর্ণ হয়নি তাই এখন কিছু বলা সম্ভব নয়।

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র পারস্পরিক শুল্ক আরোপের ফলে ভারতবর্ষ বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হতে পারে। বছরে ভারতের আনুমানিক ৭ বিলিয়ন ডলার ক্ষতি হবার সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে বলে ইন্ডিয়ান রেটিং এন্ড রিসার্চ এর প্রতিবেদন থেকে জানা গেছে।।। ভারতবর্ষ, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র থেকে তার আমদানিকৃত পণ্যের উপর মোটামুটি ভাবে সাত শতাংশের কিছু বেশি শুল্ক আরোপ করে থাকে। অন্যদিকে ভারতের পণ্যের উপর মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র দুই শতাংশের অধিক শুল্ক আরোপ করে। সে ক্ষেত্রে ডোনাল্ড ট্রাম্প পারস্পরিক শুল্কনীতি চালু করলে ভারতের পক্ষে ক্ষতির সম্ভাবনা বেশ বেশি। পারস্পরিক শুল্ক আরোপের ফলে যে ক্ষেত্রগুলি বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারে তার মধ্যে অন্যতম অটোমোবাইল গহনা শিল্প এবং কৃষিজ পণ্য।

বর্তমান অবস্থার প্রেক্ষাপটে ভারত কি বাণিজ্য নীতি গ্রহণ করবে তা এখনো অজানা। ইউরোপিয়ান নেশন ভুক্ত দেশ গুলি চীন জাপান ইন্দোনেশিয়া, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের পারস্পরিক শুল্কনীতির মোকাবিলা করার জন্য প্রস্তুত আছে। ভারত এক্ষেত্রে তার রপ্তানি যোগ্য পণ্যের জন্য নতুন বাজারের অন্বেষণ করতে পারে। ব্রাজিল চীন দক্ষিণ আফ্রিকা প্রমুখ ব্রিক সংগঠনের অন্তর্ভুক্ত দেশগুলোর সঙ্গে ভারত তার বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে পারে। রাশিয়া ইরান ইউরোপীয় ইউনিয়নভুক্ত দেশগুলোতে ভারত নতুন বাজারের সন্ধান করতে পারে।

অন্যদিকে ডোনাল্ড ট্রাম্পের শুল্কনীতির বিশৃঙ্খল দৃষ্টিভঙ্গির ফলে, মার্কিন অর্থনীতিতে মন্দার সম্ভাবনা আছে বলে অর্থনীতিবিদরা মনে করছেন। মন্দার আশঙ্কার কারণে আমেরিকায় ,ওয়াল স্ট্রিট পতনের সম্মুখীন। এশিয়ার বাজারেও তার প্রভাব পড়েছে। ভারতের শেয়ার বাজারের লেনদেন নিম্নমুখী। আমেরিকা তে মন্দা দেখা দিলে, ভারতের অর্থনীতি ক্ষতিগ্রস্ত হবার ব্যাপক সম্ভাবনা। বাঘ সিংহের সঙ্গে খেলা বন্ধ করে মোদিজির এখন বিকল্প বাণিজ্য নীতির অন্বেষণ করা সর্বাপেক্ষা জরুরী ।

পরিবেশে দুর্বৃত্তায়ন ও আধিপত্যবাদ

বিশ্বজিৎ মুখোপাধ্যায় ও রাহুল রায়

কথামুখ

পরিবেশকে আঘাত করে মানুষের বিভিন্ন কাজকর্ম চালানোর প্রক্রিয়া পৃথিবীতে বহুদিন ধরেই ঘটছে।বিশ শতকের মধ্যভাগ থেকেই এই বিষয়টি নিয়ে নানান আলোচনা আমাদের সামনে এসেছে। সেই সময়েকোন্‌টিপরিবেশ-বান্ধব এবং কোন্‌টি পরিবেশ-বান্ধব নয়, মানুষের সামনে খুব একটা স্পষ্ট ছিলনা। কিন্তু বিশ শতকের শেষভাগে বিজ্ঞানীদের দ্বারা এটা প্রমাণিত হয়ে গেল, মানুষের কী কী কাজ পরিবেশ- বান্ধব এবং কোন্ কাজগুলি পরিবেশের ক্ষতিকরে। বিগত শতকে মানুষের হঠকারী কাজকর্মে পরিবেশেরযে ক্ষতি হয়েছে, একুশ শতকে সে-সব শুধরে নেওয়ার একটা প্রক্রিয়া শুরু হল। এই শতককে বলা হলো 'পরিবেশ শতক'। পৃথিবীজুড়ে এই বার্তা ছড়িয়ে দেওয়ার চেষ্টাও হল। বিভিন্ন দেশে একটার পর একটা সম্মেলন হল এবং এখনও হয়ে চলেছে। এসব সম্মেলনে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ নীতি হাতে নেওয়া হল। বিশ শতকে হাতে নেওয়া পরিবেশ নীতিগুলিকেও পরিমার্জিত করা হলো।

পরিবেশ-নীতির কার্যকারিতা

এই পরিবেশ-নীতিগুলি বিভিন্ন দেশে কীভাবে কার্যকর করা হবে তা নিয়ে একটা সুনির্দিষ্ট কার্যপ্রণালী ঘোষণা করার বিষয় ছিল। এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি অগ্রণী ভূমিকা নেওয়ার কথা ছিল পৃথিবীতে যারা সবচেয়ে বেশি উৎপাদনশীল ও ভোগবাদী দেশ, তৎসহ যেসব দেশে ব্যাপক পরিমাণে মানব- সম্পদ রয়েছে। এই প্রেক্ষিতে যে'কটি দেশকে সহজেই চিহ্নিত করা যায়, যেমন- আমেরিকা, গ্রেট ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মানি, রাশিয়া, চিন -- এসব দেশগুলির একটি বড় ভূমিকা ও দায়িত্ব ছিল এই পরিবেশ-নীতিগুলিকে সদর্থকভাবে কার্যকরী করার। অদ্ভুতভাবে দেখা গিয়েছে, পরিবেশের এই নীতিগুলির কার্যকারিতা নিয়েও এইসব উন্নত দেশগুলির মধ্যে ঠান্ডা লড়াই বা প্রকাশ্যে লড়াই চলেছে। আর এখানে আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রের কথা এসে পড়ে। আমেরিকায় দ্বিতীয়বারের জন্য রাষ্ট্রপতি নির্বাচিত হয়েছেন ঘোষিত 'জলবায়ু-বিরোধী' ডোনাল্ড ট্রাম্প। মসনদে বসেই তিনি একের পর এক পরিবেশ-বিরোধী ফতোয়া জারি করছেন। সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্যের বিষয় হলো, আমেরিকার শিক্ষিত মানুষ এঁকে নির্বাচিত করলেন। তাহলে কি আমাদের ধরে নিতে হবে, আমেরিকার মানুষরা পৃথিবীর পরিবেশের উন্নতি চান না ?

ট্রাম্প-এর জলবায়ু অ্যালার্জি

ট্রাম্পের দ্বিতীয় জয়ে যে ভয়টা ছিল, সেটাই হল। যে-সব গবেষণায় 'জলবায়ু' শধটির উল্লেখ রয়েছে, ট্রাম্প সেগুলি থেকে তাঁর সমর্থন তুলে নিয়েছেন। ট্রাম্প-প্রশাসন শুধু জলবায়ু পরিবর্তনের বিষয়ে গবেষণায় নয়, এমনকি যে-সব ক্ষেত্র 'জলবায়ু' শধটি উল্লেখের দুঃসাহস দেখিয়েছে, তাদের আর্থিক অনুদানে রাশ টানা শুরু করেছে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক পরিবেশ বিজ্ঞানী গার্ডিয়ান পত্রিকা-কে জানিয়েছেন, পরিবহন দপ্তর থেকে আগে তাঁদের পুরস্কৃত করা অনুদান হঠাৎই ট্রাম্প-প্রশাসকরা তুলে নিয়েছেন। বলা হয়েছে, যতক্ষণ পর্যন্ত তাঁরা শিরোনাম থেকে 'জলবায়ু' শধটি পালটে না দিচ্ছেন, ততক্ষণ অনুদানটি বন্ধই থাকবে। ট্রাম্প-প্রশাসন যে

'জলবায়ু' শধটির ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করতে চলেছে, সেটা বিগত জানুয়ারি মাসেই মোটের ওপর আঁচ করা গিয়েছিল, যখন মার্কিন কৃষিবিভাগ তার ওয়েবসাইট থেকে জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত সব তথ্য মোছা শুরু করেছিল। হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়-এর 'ন্যাশনাল ডিজাস্টার প্রিপেয়ার্ডনেস ট্রেনিং সেন্টার'ও ট্রাম্প প্রশাসনের এমন সেন্সরশিপ-এর হাত এড়াতে পারেনি। বিশ্ববিদ্যালয়টির সিলেবাসের পাঠ্য-উপাদান থেকে সরকারি নির্দেশে এক প্রশাসক 'জলবায়ু পরিবর্তন' সংক্রান্ত উল্লেখগুলি মুছে ফেলতে বাধ্য হয়েছেন। ইউনাইটেড নেশনস্ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশন অন ক্লাইমেট চেঞ্জ থেকেও ট্রাম্প আমেরিকাকে সরিয়ে আনতে পারেন।

ঘরোয়া জীবাশ্ম জ্বালানি শিল্পের পিঠ চাপড়াতে অসংখ্য নির্মল শক্তি প্রকল্পে মার্কিন সরকারের বিনিয়োগ বন্ধ করে ট্রাম্প-প্রশাসন বৃহত্তর ক্ষেত্রে সমস্ত জলবায়ু ব্যয়-এর ওপরেই রাশ টেনেছে। প্যারিস চুক্তি থেকে সরার কথা ট্রাম্প ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন। বাইডেন-জমানার ডাইভারসিটি, ইক্যুইটি এবং ইনক্লুশন ('ডেই' বা DEI) নীতি বাতিল করেছেন। বৈদ্যুতিক গাড়ির বাধ্যতামূলক ব্যবহারও বাতিল করেছেন। ট্রাম্প-এর নতুন প্রশাসনিক পদক্ষেপে 'ডেই' শধকেও বাদ দেওয়া হয়েছে। ট্রাম্প 'নাসা'-কে তাদের ওয়েবসাইটে উল্লিখিত যে সব প্রকল্প ও কার্যসূচির নেতৃত্বে মহিলাদের নাম রয়েছে, সে সব উল্লেখ মুছে ফেলার নিদান দিয়েছেন। নাসা-র ২৩ জন বিজ্ঞানী চাকরি খুইয়েছেন। ট্রাম্প-প্রশাসন জলবায়ু পরিবর্তন সংক্রান্ত ইন্টার গভর্নমেন্টাল প্যানেল অন ক্লাইমেট চেঞ্জ (আইপিসিসি)-এর বিগত মাসে চিন দেশে অনুষ্ঠিত বৈঠকে মার্কিন জলবায়ু বিজ্ঞানীদের যোগদান করা থেকে বিরত করেছে। আইপিসিসি-এর গুরুত্বপূর্ণ আবিশ্ব জলবায়ু প্রতিবেদন তৈরিতে ট্রাম্প প্রশাসন মার্কিন বিজ্ঞানীদের কাজ বন্ধ করতে বলেছে। বিজ্ঞানীদের মতে, আবিশ্ব জলবায়ু কর্মসূচি ও গবেষণা থেকে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রকে সরিয়ে নেবার এটাই সর্বশেষ পদক্ষেপ। সাম্প্রতিক বিজ্ঞান অনুযায়ী জলবায়ু পরিবর্তন কীভাবে গ্রহটিকে প্রভাবিত করছে, আইপিসিসি তার মূল্যায়ন করে। ভূ-উষ্ণায়নে বসুন্ধরার কী কী বিপদ ঘনাচ্ছে, সে সম্পর্কে পৃথিবীর রাষ্ট্রনায়ক ও নীতি-নির্ধারকদের এই প্রতিবেদন সচেতন করে করণীয় পথ দেখায়। অথচ ট্রাম্প-প্রশাসনের জলবায়ু পরিবর্তনের ব্যাপারে নির্বোধ গোঁয়ার্তুমি কেবল জলবায়ু গবেষণার ওপরেই আক্রমণ নয়, সামগ্রিকভাবে বিজ্ঞানের ওপরেও বটে।

ক্ষোভ স্বদেশে

ট্রাম্প-প্রশাসনের মার্কিন বিজ্ঞান-ধ্বংসকারী নানান সিদ্ধান্তে দেশে ক্রমশ ক্ষোভ বাড়ছে। আমেরিকাজুড়ে প্রশাসনের ফেডারেল বিজ্ঞান-তহবিল হ্রাস, সরকারি বিজ্ঞানীদের ব্যাপক হারে বরখাস্ত, কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ৪০০ মিলিয়ন ডলার তহবিল বন্ধ করা এবং 'ডেই' উদ্যোগগুলি ভেঙে ফেলার প্রতিবাদে 'স্ট্যান্ড আপ ফর সায়েন্স' নামে বিগত ৭ মার্চ ২০২৫ দেশের ৩২টি শহরে বিজ্ঞানীরা হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে ট্রাম্প-প্রশাসনের মার্কিন বিজ্ঞানকে অবমূল্যায়নের প্রচেষ্টার বিরুদ্ধে গণপ্রতিবাদ জানাতে এক সমাবেশে যোগ দিয়েছিলেন। তাঁদের হাতের প্ল্যাকার্ড-এ লেখা ছিল , 'সায়েন্টিস্টস্ উইলনট বিসাইলেন্সড্','ফ্যাক্টস্ওভার ফিয়ার','সায়েন্সসেভস্লাইভস্','ইন সায়েন্স উই ট্রাস্ট' -- এরকম কিছু প্রতিবাদী বক্তব্য। প্যারিস-এও বিজ্ঞানীরা 'স্ট্যান্ড আপ ফর সায়েন্স' সমাবেশ ও পদযাত্রায় শামিল হয়েছিলেন বিগত ৭ মার্চ ২০২৫।

সংকট ক্রমবর্ধমান

এসব দেখার পরে কয়েকটি বিষয় আমাদের সামনে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমত, ট্রাম্প যেসব পরিবেশ-বিরোধী পদক্ষেপ নিচ্ছেন, তা কি সেদেশের মানুষ মানছেন? এসব পদক্ষেপের বিরুদ্ধে সে-দেশের অভ্যন্তরে বা বাইরের বিভিন্ন দক্ষিণপন্থী দেশে কোনওরকম প্রতিবাদ-প্রতিরোধ কি হচ্ছে? নাকি মানুষ সেগুলিকে বিনা বাক্যব্যয়ে মেনে নিচ্ছেন! কম-বেশি বামপন্থী ভাবধারায় বিশ্বাসী পৃথিবীর যেসব রাষ্ট্রনায়ক (চিন, রাশিয়া, দক্ষিণ কোরিয়া ইত্যাদি) সমাজতান্ত্রিক ধারণায় রাষ্ট্র চালান, তাঁরাও কিন্তু পরিষ্কার বলেন, আমরা মূলধনী ব্যবস্থাটাকে সামনে রেখেই এগোতে চাইছি। এমন বিভিন্ন ভাবধারার মধ্যেও পরিবেশ রক্ষার বিষয়গুলিকে সামনে রেখে প্রত্যেকেরই একটা মতৈক্যে পৌঁছানোর কথা ছিল। কিন্তু দুঃখের বিষয় সেটা হয়নি। আমরা বিভিন্ন সময়ে নানান সাম্রাজ্যবাদী রূপ দেখেছি। পৃথিবীজুড়ে নানান যুদ্ধ ঘটতে দেখেছি। কিন্তু পরিবেশের ওপর এই ভয়ংকর দুর্বৃত্তায়ন একুশ শতকে যেন ক্রমাগত বেড়েই চলেছে। আগামীদিনে পৃথিবীর পরিবেশ আর বাসযোগ্য থাকবে কি না কেউ জানে না। আবিশ্ব যুদ্ধাস্ত্রের ভয়াল হুংকার, নির্বিচার বোমা-বর্ষণ। যুদ্ধ থামার নাম নেই। বাকু-এর জলবায়ু সম্মেলনে যুদ্ধ-বিরোধী বা যুদ্ধ-বন্ধের কথা অল্পবিস্তর বলা হলেও কার্যত কিন্তু যুদ্ধ-বিরোধী অবস্থান পৃথিবীর কোন দেশই নিতে পারছে না। প্রতিটি দেশই তার আধিপত্যবাদ বজায় রাখছে। তারা যুদ্ধ করেই চলেছে।

কী আছে সামনে

মানুষের ভোগবাদী যাপনের জন্য সমস্ত দেশেই পরিবেশ আইন ভাঙা নতুন কোন বিষয় নয়। আপাতদৃষ্টিতে কোন দেশে পরিবেশ আইন প্রত্যক্ষভাবে ভাঙা না হলেও অন্যভাবে ভাঙা হয়। পৃথিবীর এখন অন্যতম এক বড় সংকট প্লাস্টিক। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশে যত্রতত্র প্লাস্টিক পড়ে থাকে। উন্নত দেশে এই বিষয়টি চোখে পড়ে না। অথচ পরিসংখ্যান বলছে, উন্নত দেশের মানুষ আমাদের চেয়ে অনেক বেশি প্লাস্টিক মাথাপিছু ব্যবহার করে।

আর এখানেই প্রশ্ন, তাহলে এই সমস্ত প্লাস্টিক যাচ্ছে কোথায়? উন্নত দেশগুলি তাদের সমস্ত প্লাস্টিক বর্জ্য সমুদ্রের বুকে জমা করছে। প্লাস্টিক নিয়ে বসুন্ধরার এই ভয়ঙ্কর নাভিশ্বাস, বা পৃথিবীজুড়ে মানুষের ভোগবাদী যাপনে প্রাকৃতিক সম্পদের ওপরে আধিপত্যের

যে অসম প্রতিযোগিতা, তা কিন্তু থামছে না কোন মূল্যেই। কিছুতেই নিয়ন্ত্রণ করা যাচ্ছে না এই ভোগবাদী যাপনকে। ফলে পরিবেশের সংকট ক্রমাগত বাড়ছে। আন্তর্জাতিক স্তরে যুদ্ধ, প্লাস্টিক, জলবায়ু পরিবর্তন ইত্যাদি সংকট নিয়ে কম-বেশি সকল দেশই ওয়াকিবহাল। পৃথিবীর প্রতিটি দেশেই পরিবেশ রক্ষাকারী আইন রচিত হয়েছে।

আন্তর্জাতিক স্তরে পরিবেশ রক্ষাকারী আইনের কার্যকারিতা অত্যন্ত নিম্নমুখী। এই একই চেহারা চোখে পড়ে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে, রাজ্যে, শহরে ও গ্রামে। পরিবেশকে রক্ষায় কিছু জায়গায় কয়েকটি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থা তাদের সামর্থ্য অনুযায়ী লড়াই চালাচ্ছে। সাম্প্রতিককালে হিমালয়-দূষণ নিয়ে লড়াই করছেন বিশিষ্ট পরিবেশকর্মী সোনম ওয়াংচুক। দীর্ঘদিন তিনি অনশনও করেছেন। কিন্তু তাঁর কথাই বা কে শুনছে!

আমাদের দেশে গঙ্গা-দূষণের প্রতিবাদে বেশ কয়েকজন সাধু প্রায় অনশন করেই মারা গেলেন। কিন্তু কার্যত এঁদের আত্মদান বিফলে গেল। গঙ্গা দূষণ হয়েই চলেছে। অর্থাৎ দেখা যাচ্ছে, পৃথিবীজুড়েই চলেছে পরিবেশের ওপর ভয়ঙ্কর অত্যাচার। এই অত্যাচার রোধ বস্তুত কোন রাষ্ট্রনায়কই করতে চাইছেন না। এঁদের প্রত্যেকের কাছেই নিজের দেশের স্বার্থ এবং আধিপত্যবাদ সবচেয়ে বড় হয়ে দেখা দিচ্ছে। আধিপত্যবাদ ও যুদ্ধবাদের বিরুদ্ধে পরিবেশবাদের লড়াই আজ তাই পৃথিবীর অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে উঠেছে। এই পরিবেশবাদই একমাত্র পারে বসুন্ধরার সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে। বসুন্ধরার সুস্থতা ফিরিয়ে আনতে আন্তর্জাতিক স্তরে এই প্রচেষ্টাই তাই একমাত্র কাম্য। এছাড়া আমাদের মুক্তি নেই।

রবীন্দ্রনাথ বহু আগেই বলে গিয়েছেন- 'বর্তমানে আমরা সভ্যতার যে প্রবণতা দেখি তাতে বোঝা যায় যে, সে ক্রমশই প্রকৃতির সহজ নিয়ম পেরিয়ে বহুদূরে চলে যাচ্ছে। খপ্রকৃতিকে অতিক্রমণ কিছুদূর পর্যন্ত সয়, তারপরে আসে বিনাশের পালা।' বিনাশ শুরু হয়ে গিয়েছে। এই বিনাশ কীভাবে ঠেকানো যাবে, এটাই আমাদের সভ্যতার সবচেয়ে বড় প্রশ্ন।

গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্র : জন কল্যাণের একটু জরুরি প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা

অশোক সরকার

ঝাড়খণ্ডের বোকারো জেলার তান্ডবালিধ গ্রাম পঞ্চায়েতের বাসিন্দা গীতা মাহিলের কাছে বিধবা পেনশন এখন প্রধান সহায়, কিন্তু তা পাওয়া সহজ ছিল না। তাঁর স্বামী হঠাৎই মারা যান এক দুর্ঘটনায়। ছোট্ট এক শিশুকে সঙ্গে নিয়ে গীতা তখন দিশাহারা। মৃত্যু সার্টিফিকেট পেতেই গলদঘর্ম। গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস প্রায় সাত কিলোমিটার দুরে, যেতে আসতেই ৩০ টাকা খরচা। ভূমিহীন আদিবাসী গীতার কাছে তখন তাও ছিল না। রেশনের চাল আর পড়শির থেকে ধার করা আলু খেয়ে দিন চলছিল। গ্রামের কেউ কেউ বলেছিল মৃত্যু সার্টিফিকেট করিয়ে দেবে তার জন্য টাকা লাগবে। কোথা থেকে আসবে সে টাকা? হাল ছেড়ে দিয়েছিলেন গীতা।

একদিন দেখেন এক দিদি হাতে কাগজপত্র নিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কি সব জিগ্যেস করছে। বলছে সে গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্র থেকে এসেছে। দৌড়ে গিয়ে সেই দিদির হাত চেপে ধরেছিলেন গীতা, তআমার স্বামীর নামে একটা মৃত্যু সার্টিফিকেট লাগবেদ। কেন? কাহিনী শুনে সেই দিদি বুঝতে পারেন গীতার অবস্থা, নিজের থেকেই বলেন 'তুমি তো বিধবা পেনশনও পাবে'। সেই বস্তুটা কি গীতা জানতেন, কিন্তু পাবার আশা কোনদিন করেননি। সুমিতা নামের সেই দিদি নিজের উদ্যোগে সব কাগজপত্র তৈরি করে, গীতার ছবি, আধার কার্ড, রেশন কার্ডের কপি লাগিয়ে গীতাকে দিয়ে ফরম ভরিয়ে সই করিয়ে নিয়ে যান। নিজের ফোন নম্বর দিয়ে যান। দিন কয়েক বাদে কেউ এসে খবর দেয় গীতাকে গ্রাম পঞ্চায়েতে একবার যেতে হবে। গ্রামেরই একজন সাইকেলের পিছনে চাপিয়ে গীতাকে নিয়ে গিয়েছিল। সুমিতা দিদি গীতার হাতে মৃত্যু সার্টিফিকেট আর বিধবা পেনশনের কাগজ তুলে দেন। শুধু তাতে তো চিড়ে ভিজবে না। ব্যাঙ্কে আকাউন্ট খুলতে হবে। সুমিতা দিদিই বিধবা পেনশনের কাগজ দেখিয়ে ব্যাঙ্কে খাতা খুলিয়ে দেন। পরের মাস থেকে বিধবা পেনশনের টাকা ঢুকতে শুরু করে।

না সুমিতা দিদি কোন স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার প্রতিনিধি নয়, তিনি গ্রাম পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্রের দুজন কর্মীর একজন। ঝাড়খণ্ডের ১১৮টি পরীক্ষামূলকভাবে এই ব্যবস্থা চলছিল, এখন সরকার তা সব পঞ্চায়েতে ছড়িয়ে দেবার উদ্যোগ নিয়েছে। উদ্যোগটির শুরু হবার পিছনে মূলে অবশ্য রয়েছে একটি সর্বভারতীয় এনজিও PRADAN।

সমস্যাটা নতুন কিছু নয়। সরকারের বহু জনকল্যাণমূলক প্রকল্পই নানা কারণে ঠিক মত রূপায়িত হয় না। ব্যাপক প্রচারের অভাব আছে, প্রকল্পের গাইডলাইন অনেক ক্ষেত্রেই স্পষ্ট নয়, প্রায় সব ক্ষেত্রেই সম্ভাব্য উপকৃতদের কি করনীয় আর সংশ্লিষ্ট দফতর বা প্রতিষ্ঠানের কোন কোন ব্যক্তির কি করনীয়, সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়াটি কি, তা স্পষ্ট নয়, জনসমক্ষে তো নেই। আজকাল সবই ডিজিটাল হয়ে গেছে, তাতে প্রক্রিয়াটি জনগণের কাছে আরও অস্বচ্ছ হয়ে গেছে, সংশ্লিষ্ট কাউকে জিগ্যেস করলে শুনতে হয় 'কম্পিউটার বলতে পারবে'। যদি কোন ভুলচুক হয়, তাহলে শোধরানোর উপায় কি তা জনসমক্ষে নেই, এমনকি প্রশাসনের সবার কাছে তা পরিষ্কার নয়, পঞ্চায়েত বা ব্লকে জেলায় সরকারি দফতরের যারা এই সব কাজ করে থাকেন তাঁদের আরও অনেক কাজ থাকে ফলে পর্যাপ্ত সময় দিতে পারেন না।

সব মিলিয়ে ঝাড়খণ্ডের মত রাজ্যে গ্রামাঞ্চলে যেখানে সরকারের উপস্থিতি এমনিতেই নিবিড় নয়, সেখানে এই সব নানা কারণে প্রকল্পগুলি প্রভাবী হতে পারে না, বিশেষত আদিবাসীদের কাছে।

প্রকল্পগুলির রুপায়ণ প্রক্রিয়াও এতটাই জটিল কেন্দ্রীভূত ও লম্বা যে কোথায় কোনটা আটকাচ্ছে তা খুঁজে পাওয়া সাধারণ মানুষের পক্ষে প্রায় অসম্ভব। নানা প্রকল্প নানা দফতরের অধীনে ফলে অনেক প্রশাসনিক কর্মীর হাত ঘুরে এই সব প্রকল্প জনগণের হাতে পৌঁছায়। সাধারণ মানুষের পক্ষে এতগুলি ঘাটতির একলা সমাধান সম্ভব নয়।

এই যে ঘাটতিগুলি বললাম তার মূলে আছে একটি প্রাতিষ্ঠানিক ঘাটতি, আর তা হল মানুষের কাছে থেকে, জনকল্যাণ প্রকল্পগুলি মানুষের কাছে সময়মত পৌঁছনো, ভুলচুক শোধরানো, অভিযোগের নিরসন করা, এবং এইগুলি তৎপরতার সঙ্গে, দায়িত্ব নিয়ে স্বচ্ছভাবে করার মত, কোন প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা নেই।

জনকল্যাণ কর্মসূচিগুলি যেমন ১০০ দিনের কাজ, রেশন পেনশন, জনধন পিএম কিষান, ইত্যাদি কর্মসূচিগুলি নানা বিভাগের কাছে থাকায় এবং তার পদ্ধতি প্রক্রিয়াগুলি জটিল হওয়ায় সাধারণ মানুষের কাছে এসব ভাল করে বুঝে সেই মত এগোনো প্রায় অসম্ভব হয়ে পড়ে।

এই পরিস্থিতিতে প্রয়োজন হয় এমন এক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা যা একদিকে সাধারণ মানুষের বিপন্নতা ও প্রয়োজনকে বুঝবে, সেইমত প্রয়োজনীয় কাগজপত্র তৈরি করে সেই প্রয়োজনগুলিকে মেটানোর চেষ্টা করবে, নানা ভুলচুকের জন্য যারা বঞ্চিত হচ্ছেন, আমলাতন্ত্রের সঙ্গে নিয়মিত সম্পর্কে থেকে সেই অভিযোগগুলির নিরসনের জন্য চেষ্টা করবে। এমন এক ব্যবস্থা যা প্রশাসনিক আমলাতন্ত্রের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে, আবার সাধারণ মানুষেরও কাছের হবে।

দীর্ঘদিন ঝাড়খণ্ডে গ্রাম পঞ্চায়েত ব্লক ও জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কাজ করার সুবাদে PRADAN বুঝেছিল যে এই ব্যবস্থাটি গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরেই হলে ভাল হয়। ঝাড়খণ্ডে ইতিমধ্যে ৮০টি ব্লকে এই ধরণের সহায়তা কেন্দ্র চলছিল। এই সহায়তা কেন্দ্রগুলি ব্লক অফিসেরই অঙ্গ ছিল। একাধিক জনসমাজের সংস্থা ও সংগঠন একসঙ্গে এসে জেলা প্রশাসনগুলির সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করে এই ব্লক স্তরের সহায়তা কেন্দ্রগুলি চালানো হচ্ছিল। যথেষ্ট সদিচ্ছা থাকা সত্ত্বেও এই সহায়তা কেন্দ্রগুলি শুধুমাত্র ব্লকের আয়তন ও জনসংখ্যার বিশালতার জন্য সাধারণ মানুষের খুব একটা কাছের প্রতিষ্ঠান হয়ে উঠতে পারেনি। প্রশাসনিক কাজগুলি যদিও তারা ভালোভাবেই করতে পারছিল।

PRADAN মনে করেছিল যে এই ব্যাবস্থাকে গ্রাম পঞ্চায়েত স্তরে নামিয়ে আনলে এর উপযোগিতা অনেকটাই বেড়ে যাবে। সেই মত গ্রাম পঞ্চায়েতের সঙ্গে কথাবার্তা শুরু হয়। ব্যাপারটা মোটেই সহজ ছিল না। গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অস্বস্তির কারণ ছিল এই সহায়তা কেন্দ্রের পরিচিতি কি হবে এবং নিয়ন্ত্রণ কার কাছে থাকবে? সাধারণভাবে এনজিও যে কাজ করে, তাতে গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতা নেত্রীদের সায় থাকলেও অস্বস্তির কারণ থাকে কারণ এতে সমাজে একটা সমান্তরাল ব্যবস্থা তৈরি হয়, সমাজে ক্ষমতার সমীকরণ কিছুটা পালটে যায়। PRADANও বিষয়টি জানত তাই প্রথম থেকেই বোঝাপড়া হয় যে সহায়তা কেন্দ্রের পরিচিতি ও নিয়ন্ত্রণ গ্রাম পঞ্চায়েতের হাতেই থাকবে। PRADAN সহায়তা কেন্দ্রের কর্মীদের একটা ভাতা দেবে, প্রশিক্ষণ দেবে, এবং এরা কেমন কাজ করছ একটা নজদারি রাখবে এবং তা গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাবে। কর্মীরা নিয়মিত তাদের কাজের ফিরিস্তি গ্রাম পঞ্চায়েতকে জানাবে, গ্রাম পঞ্চায়েতের তরফেই তারা গ্রামে ব্লক ও দরকারে জেলা অফিসে কাজ নিয়ে যাবে। গ্রাম পঞ্চায়েত এদেরকে একটা জায়গা দেবে, টেবিল চেয়ার আলমারি দেবে, কয়েকটা রেজিস্টার লাগবে সেগুলি কিনে দেবে, পঞ্চায়েতে যে জেরক্স আর কম্পিউটার প্রিন্টার আছে তা ব্যবহার করতে দেবে, PRADAN অবশ্য কিছু কেন্দ্রকে একটা ল্যাপটপ দিয়েছিল।

কিন্তু আসল কথা হল সহায়তা কেন্দ্রের কর্মী কে হবে? পঞ্চায়েত চাইল যে তারা নিজেরা নিজেরা তা ঠিক করবে। PRADAN জানত যে এই ব্যবস্থার সবচেয়ে বড় বৈশিষ্ট্য হতে হবে যে তা সাধারণ মানুষের কাছের প্রতিষ্ঠান হবে, এই কেন্দ্রের মূল দায়বদ্ধতা সাধারণ মানুষের প্রতি হতে হবে, কাজেই কর্মীদের খুব সাবধানে বাছাই করতে হবে। PRADAN এর কাজের সূত্রে বেশ কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে শক্তিশালী মহিলা সংগঠন তৈরি হয়েছিল, সেই সংগঠনগুলি গ্রামের প্রায় সব পরিবারের সঙ্গেই স্বনির্ভর দলের মাধ্যমে যুক্ত ছিল। এই সংগঠনগুলিতে বেশ কিছু দক্ষ মহিলা কর্মী তৈরি হয়েছিল। তাদের অনেককেই গ্রাম পঞ্চায়েতের নেতা নেত্রীরা চিনত জানত। PRADAN বলল যে এদের মধ্যে থেকেই বাছাই করা হোক এবং বাছাই করার প্রক্রিয়ায় মুখিয়া (গ্রাম পঞ্চায়েত প্রধান) বা তাঁর প্রতিনিধি হয় উপমুখিয়া বা সচিব সামিল হোক।

কিছু টানাপড়েনের পর বোকারো জেলার জারিধি ব্লকের ১৪টি গ্রাম পঞ্চায়েত এই প্রস্তাবে রাজি হয়ে যায়। এক মুখিয়া বলেছিলেন, 'আসলে PRADAN -এর উপর আমাদের ভরসা আছে, ওরা যা করবে পঞ্চায়েতের তাতে ভালোই হবে'। সেই মত কাজ শুরু হল। প্রথমে কর্মী বাছাই এর কাজ। ঠিক করা হল কর্মীদের মাধ্যমিক পাশ হতে হবে, সাইকেল থাকতে ও চালাতে জানতে হবে, গ্রামে তার পরিচিতি থাকতে হবে, এবং তার নেত্রী জাতীয় সম্ভাবনা থাকতে হবে। তাছাড়া গ্রামে মিটিং বা সার্ভে করার অভিজ্ঞতা থাকতে হবে আর একটু কম্পিউটার বা ইন্টারনেট ঘাঁটতে জানা থাকলে ভালো হয়। শুনে মনে হতে পারে ঝাড়খণ্ডের গ্রামে এরকম মহিলা পাওয়া বেশ দুষ্কর, তবে মহিলা সংগঠনগুলি যথেষ্ট অভিজ্ঞ ছিল বলে তা একেবারে দুর্লভ ছিল না। মুখিয়া এবং PRADAN-এর এক প্রতিনিধির সামনে সম্ভাব্য প্রার্থীদের ইন্টারভিউ হল। বাছাই করা প্রার্থীদের নাম দেওয়া হল পঞ্চায়েত সাথী।

গ্রাম পঞ্চায়েত বিল্ডিং-এ একটা ঘরে ব্যানার টাঙ্গিয়ে পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্রের যাত্রা হল। গ্রাম পঞ্চায়েত টেবিল চেয়ার আলমারি, রেজিস্টার সবই দিয়েছে। প্ল্যান হয়েছে পঞ্চায়েত সাথীরা সপ্তাহে চারদিন কাজ করবে, পালা করে একজন কেন্দ্রে বসবে আরেকজন হয় গ্রামে অথবা ব্লক অফিসে যাতায়াত করবে।

এবার তো এই পঞ্চায়েত সাথীদের প্রশিক্ষণ দিয়ে তৈরি করতে হবে। তাদেরকে প্রতিটি যোজনার খুঁটিনাটি জানতে হবে, সেগুলি কিভাবে চলে, কে কি কাজ করে কে কি সিদ্ধান্ত নেয় বুঝতে হবে, সাধারণত কি ধরণের ভুলচুক বা গোলমাল হয়ে থাকে, এবং তার জন্য সহায়তা কেন্দ্রের করণীয় কি শিখতে হবে, গ্রামে গিয়ে বাড়ি বাড়ি ঘুরে কি সমস্যা হচ্ছে সার্ভে করতে হবে , প্রশিক্ষণের অনেক দিক। একবারে সব কিছু শিখিয়ে দিলে লাভ হবে না। তাই সারা বছর ব্যাপী কিছু কিছু প্রশিক্ষণের প্ল্যান করা হল। সব থেকে গুরুত্বপূর্ণ হল হাতে কলমে শেখা। PRADAN এর পক্ষ থেকে তার বিশেষ ব্যবস্থা করা হল। অন্যদিকে গ্রাম পঞ্চায়েত ও PRADAN যৌথভাবে ব্লক ও জেলা প্রশাসনে এই সহায়তা কেন্দ্রের সপক্ষে সওয়াল করে এর এক মৌখিক স্বীকৃতি আদায় করে। সেটা খুব একটা কঠিন হয় নি, কারণ কয়েক বছর ধরেই ব্লক অফিসের অঙ্গ হিসাবে নাগরিক সহায়তা কেন্দ্র ৮০টি ব্লকে চলছিল কাজেই এর উপযোগিতা নিয়ে কারুর বিশেষ সন্দেহ ছিল না। আর এই পর্যায়ে সরকারের কোন খরচা ছিল না।

প্রথম বছর তো কাজ বুঝতে ও প্রশাসনতন্ত্রের সব অঙ্গের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করতেই কেটে গেছে। ইতিমধ্যে অবশ্য কিছু কিছু কাজ হয়েছে। যেমন ১০০ দিনের কাজের জব কার্ডের পুনরনবীকরণ, নতুন নাম ঢোকানো, পেমেন্ট ফলো আপ করা, বিধবা পেনশন, রেশন কার্ডের বায়মেট্রিক সংক্রান্ত কিছু কাজ ইত্যাদি। ক্রমশ গ্রাম পঞ্চায়েতও বিষয়টিতে আগ্রহ নিতে শুরু করে। তার প্রমাণ পঞ্চায়েত মিটিঙে পঞ্চায়েত সাথীদের নিয়মিত ডাক পড়ত, ত্বলুন কি কাজ হল, অমুকের অমুকটা হয়ে গেছে? ইত্যাদিদ। গ্রামেও ক্রমশ পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্রের পরিচিতি বাড়ল। দিদিদের দেখতে পেলেই কেউ না কেউ এগিয়ে আসে। বলে তআমার এটা করতে হবে, আমি এটা পাচ্ছি নাদ। বলতেই হয় পঞ্চায়েত সাথীরা সত্যিই মনপ্রাণ দিয়ে কাজ করেছেন। চারদিন তো বটেই, অনেকক্ষেত্রেই প্রথম বছরে পাঁচ দিনও তাঁরা হাসিমুখে কাজ করেছেন।

ক্রমশ তাঁদের কাজের কথা ব্লক এমনকি জেলা প্রশাসনের কাছে পৌঁছয়, অন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে তো বটেই। একে একে কিছু গ্রাম পঞ্চায়েত এগিয়ে আসে। তআমাদের পঞ্চায়েতেও শুরু করুন না?দ যে শর্তে প্রথম পাঁচটি গ্রাম পঞ্চায়েত রাজি হয়েছিল সেই তারা শর্তেই রাজি হয়। PRADAN-এর কাছে আর কিছু গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায়তা কেন্দ্র খোলার জন্য টাকা পয়সা ছিল তাই PRADANও উৎসাহ দেখায়। ইতিমধ্যে এক দাতা সংস্থা এই ব্যবস্থাটি দেখে ১০০টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায়তা কেন্দ্র খোলার জন্য PRADAN-কে টাকা দেয়। ফলে পরের দু বছরে মোট ১১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায়তা কেন্দ্র চালু হয়। এখন ১১৮টি গ্রাম পঞ্চায়েতেই পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্র চালু আছে।

শুরু হয়েছিল কাজের গ্যারান্টি, রেশন আর পেনশন সংক্রান্ত বিষয়ে যে সব সহায়তা প্রয়োজন তাই নিয়ে। এক তো ছিল নতুন নাম ঢোকানো, দুই, কোন কারণে সহায়তা বন্ধ হয়ে যাওয়া কেসগুলিকে আবার চালু করা। তিন, নানা রকম ভুলচুকের সমাধান করা, যেমন টাকা না আসা, এর টাকা ওর ব্যাঙ্ক আকাউন্টে চলে যাওয়া, ইত্যাদি। চার, নাম ঠিকানা ও তার বানান সংশোধন তো ছিলই। ক্রমশ তার সঙ্গে যোগ হল প্রধানমন্ত্রী মাতৃবন্দনা যোজনার টাকা, নির্মাণ কর্মীদের সহায়তা, ই-শ্রম পোর্টালে নাম ঢোকানো, অসংগঠিত শ্রমিকদের সহায়তা ইত্যাদি।

সহায়তা কেন্দ্রগুলি প্রথমে যত রকমের সহায়তা দিত তার আলাদা আলাদা করে হিসেব রাখতে, পরে দেখা গেল অত আলাদা করে হিসাব রাখা সম্ভব হচ্ছে না, তাই মাত্র উপরে উল্লিখিত কয়েকটা ভাগেই সেই তথ্য রাখা হত। তার থেকে সম্মেলন করে নিচের সারণিতে শুধু প্রতিটি যোজনায় কত কেস পেয়েছে আর কত কেস সামাধান হয়েছে তার জানুয়ারি ২০২৫ পর্যন্ত তালিকা সাজিয়ে দিলাম।

যোজনা	কেস পেয়েছে	সমাধান হয়েছে
১০০ দিনের কাজের গ্যারান্টি	১৬৯১১	১৪৯৩৮
রেশন	৬৮২৮	৫৪৯৬
নাশানাল সোশাল আসিস্টান্স প্রোগ্রাম	৪০৫৯৫	৩৩৫০৫
মাত্র বন্দনা যোজনা	১১৭৪	৩৩৩
ই-শ্রম	৭৪৮	৬১৩
নির্মাণ কর্মী সহায়তা	২১৭	১৭৪
অন্যান্য	৩৪৬৬৪	২১৬২৪

দুটি সংখ্যার ফারাকের পিছনে তিনটি কারণ আছে, এক তো কিছু কেস সমাধানের প্রক্রিয়ায় আছে, দুই হল কিছু কেস পর্যাপ্ত কাগজপত্রের অভাবে এগোনো যায়নি, আর তৃতীয় হল বেশ কিছু কেস আছে যার সমাধান জেলা স্তরে হয়, এবং পঞ্চায়েত সাথীদের পক্ষে জেলা সদরে গিয়ে বারবার তাগাদা দিয়ে সেগুলিকে সমাধান করে আনা সম্ভব হচ্ছে না। তবু এই ব্যবস্থার উপযোগিতা নিয়ে আজ কারুর মনে সন্দেহ নেই।

ইতিমধ্যে ২০২৩ সালেই PRADAN বুঝতে পারে, দাতা সংস্থার টাকা দিয়ে এই ব্যবস্থার উপযোগিতা প্রমান করা যাবে কিন্তু ধারবাহিকভাবে চালানো যাবে না। কাজেই সরকারের কাজে দরবার করা শুরু হয়। মুল খরচা একটাই পঞ্চায়েত সাথীদের ভাতা। দুজন সাথীকে ৪৫০০/- থেকে ৫০০০/- টাকা করে দেওয়া হত, অর্থাৎ বছরে একটি পঞ্চায়েতে খরচা ১ থেকে ১.২০ লাখ টাকা। বাকি টেবিল চেয়ার, আলমারি ল্যাপটপ ইত্যাদির খরচা এককালীন বড়জোর ১ লাখ টাকা। এই টাকা গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেই দিতে পারে, যদিও ঝাড়খণ্ডের গ্রাম পঞ্চায়েতগুলির সেই ধারণা ছিল না। তবে সৌভাগ্য এই যে রাজ্য স্তরে কিছু আমলা এই ব্যাপারে আগ্রহ দেখান, তাঁরা কিছু সহায়তা কেন্দ্রে যান, নিজের চোখে সব কিছু দেখেন, এবং

ফলস্বরুপ ২০২৪ এর প্রথম দিকে সরকার সিদ্ধান্ত নেয় সব গ্রাম পঞ্চায়েতে সহায়তা কেন্দ্র খোলা হবে। বাজেটে টাকাও বরাদ্দ হয়েছে। আশা করা যায় কিছুদিনের মধ্যেই পঞ্চায়েত সহায়তা কেন্দ্র ঝাড়খণ্ডের সব গ্রাম পঞ্চায়েতে চালু হয়ে যাবে, এবং সাধারণ মানুষ তার উপকার নিতে পারবেন।

(লেখক আজিমজি প্রেমজি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক)

মার্কসীয় পরিবেশ ভাবনা এক দীপান্বিত অন্বেষা

রাহুল রায়

মুখপাত

নানান আর্থ-সামাজিক কারণে, বিশেষত শিল্পবিপ্লবের পরে, মানুষের চেতনা ও জীবন যে ভয়ানক সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল, তা নিয়ে কার্ল মার্কস গভীরভাবে চিন্তিত ছিলেন। শ্রমিক-শ্রেণির ওপর পুঁজিবাদীদের শোষণে যে ধনতান্ত্রিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থার দ্রুত বিকাশ ঘটছিল, মার্কস দেখেছিলেন, তাতে সমস্তরকম মূল্যবোধ এবং সম্পর্ক, এমনকী প্রকৃতির সঙ্গেও, টাকার অংকে বাজারি দামে নির্ধারিত হচ্ছিল। মার্কস একে বললেন 'বিচ্ছিন্নতা' (এলিয়েনেশন) -- প্রকৃতির সাথে মানুষের, মানুষের নিজের জীবনীশক্তির সাথে নিজের এবং মানুষের সাথে মানুষের এক বিচ্ছেদ। তিনি বিশ্বাস করতেন, প্রকৃতির সাথে মানুষের এই বিচ্ছিন্নতাকে জোড়া দিতে পারে একমাত্র সাম্যবাদ।

পরিবেশ (বাস্তুতান্ত্রিক) সংকট নিয়ে মার্কস-এর এক গভীর অন্তর্দৃষ্টির কথা মেনে নিয়েও বেশ কিছু সবুজ-সমাজতান্ত্রিকের (ইকোসোশ্যালিস্ট) মতে এটি বেশ প্রান্তিক। কারণ, মার্কস কখনও নিজেকে 'প্রমেথিয়ানিজম' (যে কোনও মূল্যে শিল্পায়নের প্রতি চরম অঙ্গীকার) থেকে মুক্ত করতে পারেননি। এঁদের বিবেচনায় মার্কস পুঁজিবাদকে প্রমেথিয়ান শক্তি বলে ভেবেছেন। পুঁজিবাদ যেভাবে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিকে ব্যবহার করে উৎপাদন ও মুনাফা ক্রমশ বাড়িয়ে তোলে, এক বিপুল উৎপাদিকা শক্তির সামনে আমাদের মাথা নোয়াতে বাধ্য করে, মার্কস-এর দৃষ্টিতে সে-টুকুই সব। প্রকৃতি-পরিবেশের ধ্বংস নিয়ে তিনি তেমন ভাবিত নন। ক্যাপিটালিজম, নেচার, সোশ্যালিজম পত্রিকায় প্রকাশিত 'মার্কসেস ইকোলজি অর ইকোলজিক্যাল মার্কসিজম ফেইলড্‌প্রমিস'প্রবন্ধে (জুন, ২০০১) মার্টেন ডিকাট এবং সালভাতোর এঞ্জেল-ডি মাউরো বলেন, বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বিকাশ সম্পর্কিত মার্কস-এর কোন মৌলিক অবদান নেই। কারণ, তিনি যা কিছু লিখেছেন সব উনিশ শতকে, পরমাণু যুগের এবং পলিক্লোরিনেটেড বাইফিনাইল, ক্লোরোফ্লুরোকার্বনস্-এর আবির্ভাবের আগে। তাই তাঁর লেখাপত্রে তিনি কোথাও 'ইকোলজি' শধটি ব্যবহার করেননি। আর ঠিক এখান থেকেই আমরা একটু দেখার চেষ্টা করতে পারি, পুঁজিবাদী উৎপাদন ব্যবস্থায় প্রকৃতি-মানুষ সম্পর্কে যে চিড় ধরেছে, তা নিয়ে মার্কস কতটা সচেতন বা উদ্বিগ্ন ছিলেন। বা আদৌ ছিলেন কি না।

লিবিগ-মার্কস যোগসূত্র এক প্রয়োজনীয় প্রসঙ্গ

বিখ্যাত জার্মান রসায়নবিদ জাস্টাস ভন লিবিগ ১৮৬২ সালে তাঁর বই 'অর্গানিক কেমিস্ট্রি ইন ইটস্ অ্যাপ্লিকেশন টু এগ্রিকালচার অ্যান্ড ফিজিওলজি'-তে খোলাখুলি বলেন, ব্রিটেন-এর নিবিড়-কৃষি (বা 'হাই ফার্মিং') আদতে এক লুঠ-পদ্ধতি। এটি যুক্তিসংগত (র‍্যাশনাল) কৃষিব্যবস্থার বিরোধী। এই লুঠ- ব্যবস্থায় গ্রাম থেকে দূরদূরান্তে শহরে খাদ্যশস্য ও তন্তু-ফসলের পরিবহন অপরিহার্য হয়েছে, সামাজিক পুষ্টির (যেমন- নাইট্রোজেন, ফসফরাস ও পটাশিয়াম) কোনরকম পুনর্সঞ্চলন ছাড়াই। এই যাত্রার নিট ফল মানুষ ও পশুর দেহ-নিঃসৃত বর্জ্যরূপে শহুরে বর্জ্য এবং দূষণের সৃষ্টি। সমস্ত গ্রামের মাটি থেকে এভাবে পুষ্টি লুঠ হচ্ছে। লিবিগ-এর মতে, এই ঘটনা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদেরই এক নীতি। ইংল্যান্ড তার শিল্পায়িত পুঁজিবাদী কৃষি ব্যবস্থা চালু রাখতে পেরু থেকে পাখির মল এবং ইউরোপ থেকে হাড়গোড়ও আমদানি করল, যেগুলি স্বাভাবিক অবস্থায় মাটিতে মিশে সেখানকার মাটির পুষ্টি বাড়িয়ে তাকে আরও উর্বর করত। এক্ষেত্রে তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ মন্তব্য- 'লুঠ লুঠের কৌশলকে আরও উন্নত করে।' মার্কস লিবিগ-এর বইটি পড়ে ১৮৬৬ সালে এঙ্গেলস-কে এক চিঠিতে আধুনিক কৃষির এই ধ্বংসাত্মক রূপটি সম্পর্কে জানিয়েছিলেন। এমনকি 'ক্যাপিটাল' বই-এর প্রথম খণ্ডে এই কাজকে লিবিগ-এর 'অন্যতম অমর কীর্তি' বলেও উল্লেখ করেছিলেন।

বিপাকীয় চিড় (মেটাবলিক রিধ)

আধুনিক কৃষির ধ্বংসাত্মক রূপটির আলোচনায় মার্কস বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ দিক তুলে ধরেছিলেন। মানুষ এবং এই পৃথিবী গ্রহটির মধ্যে যে 'বিপাকীয় মিথস্ক্রিয়া' (প্রকৃতি-নির্ধারিত চিরস্থায়ী উৎপাদন পরিস্থিতি) রয়েছে, পুঁজিবাদ তাতে এক অপূরণীয় চিড় ধরিয়েছে। 'সামাজিক উৎপাদনের এক নিয়ন্ত্রিত বিধি' হিসেবে এই জরুরি বিপাকীয় সম্পর্কের 'রীতিবদ্ধ পুনরুদ্ধার' প্রয়োজন। এই 'বিপাকীয় চিড়' সত্ত্বেও, পুঁজিবাদী বৃহদায়তন কৃষির বিকাশ এবং দূরদূরান্তে ব্যবসা-বাণিজ্য এই চিড়টিকেই আরও ঘনীভূত এবং প্রসারিত করছে। শহরগুলিতে দূষণ এবং বর্জ্যের মধ্য দিয়ে মাটির পরিপোষক পদার্থের অপচয় দেখা যাচ্ছে। বৃহদায়তন যান্ত্রিক ধ্বংসাত্মক কৃষি ব্যবস্থায় মাটি ক্রমশ নিস্তেজ, অনুর্বর হয়ে পড়ছে। গ্রাম এবং শহরের মধ্যে এই দ্বান্দ্বিক সম্পর্কটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থারই প্রকাশ। এক যুক্তিসঙ্গত কৃষি-ব্যবস্থা, যেখানে ছোট চাষিরা নিজেরাই ফসল ফলাবে, বা সেখানে সহযোগী উৎপাদকরাও থাকবে, তা আধুনিক পুঁজিবাদী

পরিস্থিতিতে অসম্ভব। এমন পরিস্থিতি মানুষ এবং পৃথিবীর মধ্যে বিপাকীয় সম্পর্কটির এক যুক্তিগ্রাহ্য নিয়ন্ত্রণের দাবি জানায়, যা পুঁজিবাদী সামাজিক গড়নের পরিবর্তে সমাজতন্ত্র এবং সাম্যবাদের পথেই সম্ভব। মার্কস 'সামাজিক বিপাক'-এর (সোশ্যাল মেটাবলিজম) ধারণা আমাদের দেন। এই ধারণায় শ্রম-এর মাধ্যমে মানুষ ও প্রকৃতির মধ্যে বস্তু বিনিময় হয়। পুঁজিবাদী উৎপাদন কাঠামোর সমালোচনায় মার্কস এই 'বিপাকীয় চিড়'-এর তত্ত্বটি সামনে আনেন। শিল্প-প্রাযুক্তিক কৃষি এবং নগরায়নের প্রভাবে প্রকৃতির স্বাভাবিক চক্র বা ভারসাম্যে যে ছন্দপতন সূচিত হয়েছে, তাকে মার্কস 'বিপাকীয় চিড়' বলেছেন। এই ধারণার মধ্য দিয়ে মার্কস মানুষের নানান কাজকর্মের এক বৃহত্তর বাস্তুতান্ত্রিক এবং সামাজিক প্রভাবের দিকটি তুলে ধরতে চেয়েছেন। ধারণাটি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে মার্কস ও এঙ্গেলস কেবল মাটির পরিপোষক পদার্থ বা গ্রাম-শহরের সম্পর্কের মধ্যেই আটকে থাকেননি। পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় পরিবেশের ক্রমাগত অবক্ষয়ে সৃষ্ট নানান পরিবেশ সংকট তাঁদের চোখের আড়াল হয়নি। তাঁদের নানান রচনায় বনভূমি কেটে ফেলা, মরুভূমির আগ্রাসন, জলবায়ু পরিবর্তন, বনভূমি থেকে ক্রমশ হরিণ মুছে যাওয়া, প্রজাতির পণ্যায়ন, দূষণ, শিল্পজাত বর্জ্য, বিষাক্ত সংক্রমণ, পুনরাবর্তন, খনি থেকে কয়লা ফুরিয়ে আসা, রোগবালাই, অতি-জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং প্রজাতির বিবর্তন নিয়ে আলোচনা রয়েছে।

মার্কসীয় বাস্তুতান্ত্রিক বস্তুবাদ ফিরে দেখা

মার্কসীয় পরিবেশ বীক্ষা আলোচনায় ফ্রেডেরিক এঙ্গেলস-এর উল্লেখ আপনিই এসে পড়ে। মার্কসবাদ নিয়ে প্রায়ই এক তর্কবিতর্ক ওঠে যে, বাস্তুতান্ত্রিক চিন্তাভাবনার বিকাশে মার্কস ও এঙ্গেলস-এর পরে মার্কসবাদকে খুব একটা খুঁজে পাওয়া যায়নি, অথবা এটি বাস্তুতন্ত্র-বিরোধী। কিন্তু এই বক্তব্যটি ঠিক নয়। প্রকৃতি-সমাজ সম্পর্কে মার্কসীয় অজস্র গভীরগামী বিশ্লেষণ রয়েছে। উৎপাদন শক্তির বিকাশে পুঁজির গুরুত্ব সম্পর্কে মার্কস ও এঙ্গেলস সচেতন থাকলেও পরিবেশ ধ্বংসের বিষয়ে কেউই উদাসীন ছিলেন না। ১৮৪৩ সালে 'আউটলাইনস্ অফ আ ক্রিটিক অফপলিটিক্যাল ইকোনমি' প্রবন্ধে এঙ্গেলস খোলাখুলি জানিয়েছিলেন, জমির ওপর ব্যক্তিমানুষের মালিকানা একদিকে ক্রমশ আরও বেশি মুনাফার লোভে ছুটছে, আর অন্যদিকে প্রকৃতিকেও সমানভাবে ধ্বংস করছে। মার্কস এবং এঙ্গেলস প্রকৃতির এক বস্তুবাদী ধারণা দিয়েছিলেন, যেটি তাঁদের সময়ে বিজ্ঞানের প্রধান বৈপ্লবিক অগ্রগতির ভিত গড়ে দিয়েছিল (ডারউইন-এর তত্ত্বেই এটি স্পষ্ট)। মার্কস-পরবর্তী ১৯৪০-এর দশক ধরে যে সমস্ত সমাজতান্ত্রিক ও প্রকৃতিবিজ্ঞানী তাঁদের চিন্তাভাবনায় প্রকৃতিবাদী এবং বাস্তুতান্ত্রিক ধারণাকে স্থান দিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি নাম হল উইলিয়াম মরিস, হেনরি সল্ট, অগাস্ট বেবেল, রোজা লুক্সেমবার্গ, ভি আই লেনিন, জে বি এস হ্যালডেন, জোসেফ নিডহ্যাম প্রমুখ।

মার্কসীয় পরিবেশ বীক্ষা - বিতর্কিত মূল্যায়ন

পরিবেশের বিষয়গুলিকে গুরুত্ব দেওয়ার পরেও মার্কস-এর রচনাবলি চারটি শিবিরভুক্ত হয়ে পড়ে। ক) মার্কস-এর চিন্তাভাবনা আগাগোড়াই বাস্তুতন্ত্র-বিরোধী বলে একটি শিবির বিতর্ক জুড়ে বলল, সোভিয়েতি রেওয়াজের সঙ্গে এটি হুবহু এক। খ) একদল দাবি করল, বাস্তুতন্ত্র সম্পর্কে মার্কস-এর উজ্জ্বল অন্তর্দৃষ্টি থাকলেও শেষ অধি উনি প্রমেথিয়ানিজম-এই বিভোর ছিলেন। গ) একদলের মতে, মার্কস কৃষি-ব্যবস্থার মধ্যে বাস্তুতান্ত্রিক অবক্ষয়ের বিশ্লেষণ করেছিলেন, যদিও এটি তাঁর মূল সামাজিক বিশ্লেষণ থেকে আলাদাই রয়ে যায়। ঘ) প্রকৃতি ও পরিবেশের অবক্ষয়ের ভাবনা চিন্তায় (বিশেষত মাটির উর্বরতা নিয়ে) মার্কস আমাদের এক রীতিবদ্ধ অভিমুখ দেখিয়েছিলেন। তাঁর বাকি সমস্ত ভাবনার সঙ্গে এটি বেশ আষ্টেপৃষ্ঠে জড়িয়ে থেকে এক টেকসই বাস্তুতান্ত্রিক ধারণক্ষমতার প্রসঙ্গ তুলে ধরেছে।

বেশ কিছু অগ্রগণ্য সমাজতান্ত্রিক (মার্কস-অনুগামী এবং অনুগামী নন), যেমন- অ্যান্থনি গিডেন্স, মাইকেল রেডক্লিফট, গ্রাহাম উডগেট, অ্যালেক নোভে প্রমুখ মার্কসীয় পরিবেশ বীক্ষার ধারালো সমালোচনা করেছেন। এঁদের সমালোচনার কথাসার হল, মার্কস বেশ কয়েকটি বিষয়ে চোখে ঠুলি পরেছিলেন, যেমন- প্রকৃতিকে শোষণ করা, মূল্য সৃষ্টির বিষয়ে প্রকৃতির ভূমিকা, সুস্পষ্ট প্রাকৃতিক সীমার অস্তিত্ব, প্রকৃতির পরিবর্তনীয় চরিত্র এবং মানবসমাজে এর প্রভাব, পরিবেশীয় অবক্ষয়ে প্রযুক্তির ভূমিকা এবং পরিবেশ সংকট সমাধানে কেবলই অর্থনৈতিক প্রাচুর্যের অক্ষমতা।

আবার এই মতের বিরোধীদের বক্তব্য হল, মার্কস তাঁর আমলের বাস্তুতান্ত্রিক সংকটের জোরালো বিশ্লেষণ করেছিলেন পুঁজিবাদী কৃষিতে মাটির উর্বরতা হ্রাস নিয়ে, বনভূমি কমে আসা প্রসঙ্গে, শহরের দূষণ নিয়ে, ম্যালথাস-এর অতি-জনসংখ্যা ধারণা নিয়ে এবং সর্বোপরি গ্রাম ও শহরের বিরোধ নিয়ে। মানুষ-প্রকৃতির বিপাকীয় সম্পর্কের চিড়টি মেরামত করতে বাস্তুতান্ত্রিক ধারণক্ষমতাকে রক্ষা করার প্রয়োজনীয়তার কথা তিনি বলেছেন। মার্কসীয় পরিবেশ-বীক্ষায় বিশ্বাসীরা মনে করেন, 'বিপাকীয় চিড়' তত্ত্বে এবং চার্লস ডারউইন-এর 'বিবর্তনবাদ' তত্ত্বের প্রতিক্রিয়ায় মার্কস আমাদের 'ঐতিহাসিক-পরিবেশিয়-বস্তুবাদ'-এর পথে অনেক দূর এগিয়ে দেন, যা প্রকৃতি এবং মানবসমাজের সহবিবর্তন বুঝতে সাহায্য করে।

শেষের কথা

মানুষ-প্রকৃতি সম্পর্ক নিয়ে মার্কস কিছু ক্ষেত্রে প্রকৃতির ওপর মানুষের শোষণের সরাসরি সমালোচনা করেছেন। 'অন দ্য জিউইশ কোয়েশ্চেন' (১৮৪৪) প্রবন্ধে তিনি লিখেছিলেন, 'প্রকৃতিকে ব্যক্তিগত সম্পদের মতো দেখা হয়; প্রকৃতির এই অবস্থা ও তার অবনতির জন্য পুরোপুরি দায়ী হল টাকা।' আবার ওই প্রবন্ধেই টমাস মুনজার-কে উদ্ধৃত করে লিখলেন- 'জলের মাছ, আকাশের পাখি,

পৃথিবীর গাছপালাকে ব্যক্তিগত সম্পদে পরিণত করা মোটেই বরদাস্ত করা যায় না। সমস্ত প্রাণী মুক্ত বা স্বাধীন থাকবে।' মার্কস জোর দিয়ে বললেন, আমরা এই গ্রহটির মালিক নই। উত্তরাধিকার সূত্রে এর সম্পদ দেখভাল ও কিছু ক্ষেত্রে ভোগ করার অধিকার পেয়েছি মাত্র। এই পৃথিবীকে আরও উন্নত অবস্থায় পরবর্তী প্রজন্মের হাতে আমাদের দিয়ে যেতে হবে। ব্রান্টল্যাণ্ড কমিশনের প্রতিবেদনেও (১৯৮৭) প্রকৃতিকে রক্ষা করার এই দায়বদ্ধতার কথাই বলা হয়েছে।

গফুররা ফুলবেড়ের পথে : সেদিন ও আজ

খগেন্দ্রনাথ অধিকারী

সমাজ বিকাশের তৃতীয় স্তর হোল সামন্তবাদের স্তর এবং চতুর্থ স্তর হোল পুঁজিবাদের স্তর। কথাশিল্পী শরৎচন্দ্র ছিলেন এই দুই যুগের বহুক্ষণের সাক্ষী। সামন্ততন্ত্রের অবক্ষয় ও পুঁজিবাদের উদ্ভবের ছবি ফুটে উঠেছে তাঁর রচনার মধ্যে। ১৯২২ সালে তিনি লেখেন তাঁর অমর সৃষ্টি 'মহেশ' । এখানে দেখা গেছে যে সেই 'বঙ্গ দেশের কৃষক' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র যে কথা লিখেছিলেন, 'জীবের শত্রু জীব, মানুষের শত্রু মানুষ, বাঙালী কৃষকের শত্রু বাঙালী ভূস্বামী।. . . জমীদার নামক বড় মানুষ, কৃষক নামক ছোট মানুষকে ভক্ষণ করে।' সেই কথা অক্ষরে অক্ষরে খেটেছে উল্লিখিত 'মহেশ' গল্পের মুখ্য চরিত্র গফুর শেখের জীবনে। জমিদারদের অত্যাচার এবং সেই সঙ্গে সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার অন্ধ কুসংস্কার, ধর্মীয় মতান্ধতা ইত্যাদির কষাঘাতে জর্জরিত গফুর শেখ তাঁর বসত গ্রাম কাশীপুর ছেড়ে, মেয়ে আমিনাকে নিয়ে রাতের অন্ধকারে চলে যাচ্ছে ফুলবেড়ের চটকলে কাজ করতে। যাবার আগে 'অনাহার ক্লিষ্ট শীর্ণদেহ' মহেশের গায়ে হাত বুলিয়ে অসহায়ভাবে বলেছে 'এই দুর্ব্বছরে তোকে কেমন করে বাঁচিয়ে রাখি বল?' কারণ 'জমিদার .... শ্মশানের ধারে গাঁয়ের যে গোচারণ টুকু ছিল, তাও পয়সার লোভে জমা বিলি করে দিলে।'

বিংশ শতাধীর প্রথমার্ধে ইংরেজ শাসন আমলে অবিভক্ত বাংলা তথা ভারতের বুকে ক্ষয়িষ্ণু সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থার ছবি ফুটে উঠেছে যেমন এই রচনাতে, তেমনি 'ফুলবেড়ের চটকলে' গফুর শেখ ও তার মেয়ে আমিনার কাজের সন্ধানে পথ চলার মধ্য দিয়ে ভারতে পুঁজিবাদের উদ্ভবের ইঙ্গিতও স্পষ্ট। গফুর বা আমিনা কোন বিচ্ছিন্ন চরিত্র নয়। শরৎচন্দ্রের আঁকা এই মানুষ দুইটি এক যুগ সন্ধিক্ষণের প্রতিনিধি। সমাজতত্ত্বের পরিভাষায় বলতে গেলে বলা চলে যে সামন্ততান্ত্রিক সমাজ কাঠামোয় জমিদারদের হাতে কৃষকরা নির্যাতিত হয়েছে। গোচারণ ভূমিটুকুও জমিদাররা বন্দোবস্ত দিয়েছে। 'মহেশ'-এর মত গবাদি পশুগুলি খাদ্যের অভাবে তিলে তিলে কঙ্কালসার হয়েছে। আর সর্বস্ব হারিয়ে গফুরের মত হতদরিদ্র কৃষকরা গ্রাম ছেড়ে শহরের কলকারখানায় কাজের সন্ধানে ছুটেছে।

সামাজিক পরিবর্তন বা "Social Change"-এর এই ছবি অবিভক্ত বাংলা বা ভারতের ক্ষেত্রে নতুন কিছু নয়। সামন্ততন্ত্র থেকে ধনতন্ত্রের দিকে অগ্রসরণের এটাই হচ্ছে সর্বজনীন ছবি। পৃথিবীর সমস্ত দেশের ক্ষেত্রেই এটা ঘটেছে। আমাদের এখানেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। কিন্তু কথা হোল যে বঙ্কিমচন্দ্র বা শরৎচন্দ্রের যুগে আমরা আজ আর বসে নেই। তাঁদের যুগটা ছিল পরাধীনতার যুগ, বিদেশী শাসনের যুগ। কিন্তু, আমরা তো আজ বাস করছি একটি স্বাধীন দেশে। পৌণে এক শতাধী হোল আমরা স্বাধীন হয়েছি। আমাদের দেশের বুকে বারোটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার ও তিনটি বার্ষিক পরিকল্পনার কাজ শেষ হয়েছে। বর্তমান বি.জে.পি শাসনকালে পরিকল্পনা কমিশন অবলুপ্ত হয়ে নীতি আয়োগ তৈরী হয়েছে। কিন্তু এসবের নীট ফল কি?

এসবের নীট ফল হোল আমাদের গোটা অর্থনীতির উপর "Corporate Capital" এর লাগামহীন দাপট। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় গ্রামীন জনতার স্তরে শেষ কথা বলতেন জমিদার জোতদাররা। এখন জমিদার রাজ ,জোতদাররাজের অবসান ঘটেছে। তাঁদের স্থান দখল করেছে "Corporate Capital" এর মাতব্বররা। এদের অর্থ বল ও পেশীবলের কোন মা বাপ নেই। উল্লেখ্য যে কমিউনিস্ট পার্টির ইস্তেহারে কার্ল মার্কস ও ফ্রেডারিখ এঙ্গেলস লিখেছেন যে ইতিহাসে বুর্জোয়ারা একটা প্রগতিশীল ভূমিকা পালন করেছে। সামন্ততান্ত্রিক ব্যবস্থায় কুসংস্কারে আচ্ছন্ন মানুষদের চিন্তাভাবনাকে পুঁজিবাদ বিজ্ঞানমুখী ও যুক্তিমুখী করেছে,এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু মোদী জামানায়, বিশ্বায়ন, উদারীকরণ ও বেসরকারীকরণের মীথক্রিয়ায় "Corporate Capital" নামক যে দানবের সৃষ্টি হয়েছে, তার কোন মানবমুখী ভূমিকা লক্ষ্য করা যাচ্ছে না।

শিল্প ক্ষেত্রে এই "Corporate Capital" ক্ষুদ্র ও কুটীর শিল্পসহ যাবতীয় শিল্পগুলিকে এক বৃহৎ ছাতার তলায় বা "Umbrella organization" এর অধীনে এনে নিজেদের ইচ্ছামত উৎপাদন ,বন্টন ও মূল্যনির্ধারণ করছে। কৃষিক্ষেত্রে এই পুঁজির কাণ্ডারীরা, যাদের সম্পর্কে কাজী নজরুলের কথায় বলতে হয়,

''মাটিতে যাদের ঠেকেনা চরণ,
মাটির মালিক তাহারাই হন,
যে যত ভণ্ড ধড়িবাজ আজ
সেই ততো বলবান।''

এখানে উল্লেখ করা দরকার যে সারা ভারত কৃষকসভা সহ বিভিন্ন কৃষকসভার নেতৃত্বে সংসদের ভিতরে কমরেড প্রবোধ পাণ্ডা, মনোরঞ্জন শূর, ইন্দ্রদীপ সিনহা, ভোগেন্দ্র ঝা, হান্নান মোল্যা, এবং রাজপথে কমরেড অতুল কুমার আনজান, মানিক সরকার, প্রমুখদের চালিত নিযুত কৃষকদের আপোষহীন সংগ্রামের চাপে আমাদের কেন্দ্রীয় সরকার ২০০৪ সালে যে স্বামীনাথন কমিশন বসান এবং যার অন্যতম সভ্য ছিলেন কমরেড অতুল কুমার আনজান, সেই কমিশন দীর্ঘ পর্যালোচনার পর কৃষি ও কৃষকের উন্নতির জন্য নির্দিষ্ট কিছু

সুপারিশ করেছিলেন, যথা--

(১) কৃষি এবং কৃষি কেন্দ্রিক শিল্পের মধ্যে সমতা বজায়।
(২) গ্রামীণ জীবন ও শহুরে জীবনের বৈষয়িক বিকাশের বৈষম্য দূরীকরণ।
(৩) অসমাপ্ত ভূমি সংস্কার সম্পাদন ও ভূমিহীন, আদিবাসী ও তপশীলি সম্প্রদায়ের কৃষক ও বর্গাদারদের ভূমিস্বত্ব প্রদান ও তার রক্ষার জন্য উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ।
(৪) সমবায় প্রথায় চাষের উপর গুরুত্বদান।
(৫) সেচ, বিদ্যুৎ, বীজ ও সার ক্ষুদ্র ও মাঝারি কৃষকদের বিনা পয়সায় দান।
(৬) বকেয়া ঋণ মুকুব ও সহজশর্তে কৃষি ঋণ প্রদান।
(৭) ফসলের নায্য দাম ও সহায়ক মূল্য প্রদানের ব্যবস্থা।
(৮) সরকারী উদ্যোগে কৃষি পণ্য ক্রয়।
(৯) সমবায় ব্যাঙ্কের বিকেন্দ্রীকরণ।
(১০) ফসল বীমা।
(১১) ল্যাণ্ড--ব্যঙ্ক স্থাপন,
(১২) কৃষি পেনশন চালুকরণ,
(১৩) ভূমিক্ষয় রোধে উপযুক্ত ব্যবস্থা গ্রহণ,
(১৪) অনাবাদী, কাঁকুরে জমি, নোনা জমিকে আধুনিক প্রক্রিয়ায় আবাদী করে কৃষি জমির পরিমাণ বৃদ্ধি।
(১৫) কৃষি জমিকে অকৃষিকাজে ইচ্ছামত রূপান্তরের বিরুদ্ধে সতর্কতা গ্রহণ, (১৬) ইত্যাদি।

স্বামী নাথন কমিশনের এইসব সুপারিশুলি বা এদের ৫০শতাংশও যদি রূপায়িত হতো, তাহলে শিল্পের পাশাপাশি আজ যে কৃষিতেও corporate capital-র তাঁবেদাররা দাপট করে বেড়াচ্ছে, তারা তা পারতো না। বহুবছর আগে ব্রিটিশ শাসনে কবিগুরু 'দুই বিঘা জমি'তে লিখেছিলেন ---

'বাবু কহিলেন, বুঝেছ উপেন
ও জমি লইব কিনে।'

এযুগের কর্পোরেট বাবুরা আরও হিংস্র,আরও অমানবিক। তারা জোর করে ভয় দেখিয়ে , গুণ্ডা লেলিয়ে, ভেড়ি কেটে , কৃষি জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে , গরীব, মাঝারি, নির্বিশেষে অসহায় কৃষক ও বর্গাদারদেরকে বাধ্য করে হয় জলের দামে তাদের জমিকে ঐ কর্পোরেটদের পোষা মাফিয়াদের কাছে বিক্রি করে দিতে, অথবা তথাকথিত ক্ষ্মচুক্তি চাষক্ষ্মএর চুক্তিপত্রে অনিচ্ছা সত্ত্বেও স্বাক্ষর দিয়ে নিজেদের সর্বনাশ ডেকে আনতে। আমরা মহেশ গল্পে দেখেছি যে 'গোচারণ'ক্ষেত্রটুকুও জমিদাররা বন্দোবস্ত দিয়েছে। মহেশ মাঠের ঘাসটুকুওপায়নি। অসহায় বৃদ্ধকৃষক গফুর শেখের প্রার্থনা 'আল্লা'র কাছে, তিনি যেন এই পাপীদের 'কসুর' না করেন। আমাদের এই সময়ে 'কর্পোরেট ক্যাপিটাল ক্ষ্মএর মাফিয়াদের দানবীয়তা কৃষিজমি, গোচারণ ক্ষেত্র, সর্বত্র নোনা জল তুলে কৃষি ও কৃষককে মেরে,স্বামীনাথন কমিশনের সুপারিশ গুলিকে দুপায়ে মাড়িয়ে হাজার হাজার কোটি টাকা মুনাফা লুটতে নোনা মাছের ঘেরী কৃষি জমিতে করছে কর্পোরেট ক্যাপিটাল এর মাফিয়ারা। সেই The Rime of The Ancient Mariner -এর কবি কোলরীজের কথা মনে পড়ে --

Water water everywhere–
nor any drop to drink.

কৃষকরা মরছে, কৃষি মরছে, গফুররা মরছে, মহেশরা মরছে, ছাগল,ভেঁড়া, হাঁস, মুরগি, সবাই মরছে। পশুপালন শেষ হচ্ছে,মিঠেজলের মাছচাষ ধ্বংস হচ্ছে। দায়িত্বশীল কৃষিবিজ্ঞানী ও পরিবেশ বিজ্ঞানীরা সমীক্ষা করে দেখেছেন যে আমাদের দেশে যে বিপুল নোনা জলের ভাণ্ডার আছে, সেখানেই নোনা জলের মাছ চাষ হতে পারে। বরং যত বেশি সম্ভব নোনা জমিকে বৈজ্ঞানিক প্রক্রিয়ায় নোনা মুক্ত করে শস্য উৎপাদন করার ব্যবস্থা করতে হবে।নইলে আবার আমাদেরকে PL480 ধাঁচের মার্কিন প্রকল্পে 'পশুখাদ্য' চড়া দামে মনুষ্য খাদ্য হিসেবে কিনতে বাধ্য হতে হবে। তাছাড়া তথাকথিত নোনা মাছের চাষের নামে কৃষি জমিতে এখন যা করা হচ্ছে, তাতে অন্যান্য মাছ সহ জীববৈচিত্র্য বা "biodiversity" ধ্বংস হচ্ছে।

কর্পোরেট পুঁজির দালালরা তাদের কিছু Agent কে দিয়ে গণমাধ্যমে নোনা মাছের চাষের পক্ষে বিরামহীন প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে এর সমর্থনে জনমত গঠন করতে। ভাবটা এমন যেন মিঠে জলের মাছ চাষ, শস্য চাষ, এবং স্বাভাবিক নোনা খাল, নদী, ইত্যাদিতে নোনা মাছের চাষটা নস্যি। কৃষি জমিতে নোনা জল ঢুকিয়ে মাছ চাষ করতেই হবে। না হলে মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে। এসব হচ্ছে কর্পোরেট পুঁজির দালালদের বাহানা।ওরা এসবই করে বেশী মুনাফার জন্য। এর বিরুদ্ধে দলমত নির্বিশেষে কৃষি ও কৃষকদের স্বার্থে সমস্ত শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষদের সচেতন থাকতে হবে, প্রতিরোধ গড়ে তুলতে হবে।

মনে রাখতে হবে যে কর্পোরেট পুঁজি খুবই শক্তিশালী এবং খুবই আগ্রাসী। এদের হাত বড় লম্বা। এদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্য এরা সমাজ, সংস্কৃতি ও রাজনীতির জগতের বিভিন্ন স্তরের লোকদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। প্রখ্যাত মার্কিন রাষ্ট্র বিজ্ঞানী অস্টিন রেনী তাঁর "Governing" বইতে এ ব্যাপারে বলতে গিয়ে মন্তব্য করেছেন যে কর্পোরেট-এর দালালদের চাপ সৃষ্টিকারী গোষ্ঠী বা "Pressure Group" নানাভাবে এই ধরনের লোকদেরকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে। তার মধ্যে সব চাইতে বড় দুটো অস্ত্র তাদের হাতে হোল (১) লবিং বা তেলবাজি এবং (২) নানা রকমের উপঢৌকন নানাভাবে তাদেরকে প্রদান। আমাদের দেশ ভারতবর্ষ ও এব্যাপারে কোন ব্যতিক্রম নয়। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে এমনকি খোদ বিভিন্ন কৃষক সংগঠনগুলির ভিতরেও এরা এদের হয়ে ওকালতির দালাল তৈরী করছে। অতএব খুব সাবধান। কবি গুরুর কথায় বলি--

'সেটা সত্য হোক,
শুধু ভঙ্গি দিয়ে যেন
না ভোলায় চোখ।'

প্রত্যেকের শুধু নিজের বিবেকের কাছে উত্তর খোঁজার জন্য একটি প্রশ্ন রেখে এই আলোচনার ইতি টানছি শরৎচন্দ্রের যুগে 'কাশীপুর' গ্রামের গফুর রিক্ত নিঃশ্ব অবস্থায় তার ক্ষ্মছেলেক্ষ্ম মহেশ এর শবটা ফেলে কাজের খোঁজে 'ফুলবেড়ে'-র চটকলের দিকে মেয়ে আমিনার হাত ধরে চলেছিল রাতের অন্ধকারে।কাজ সে পেয়েছিল কিনা কে জানে? ঊনবিংশ শতাধীর পুঁজিবাদের বিকাশের কারণে সে সম্ভাবনা গফুর--আমিনাদের সামনে কিছুটা হলেও ছিল। কিন্তু আজকের একবিংশ শতাধীর গফুররা গ্রাম ছেড়ে কোথায় যাবে কাজের সন্ধানে 'কর্পোরেট ক্যাপিটাল' এর শাসনে? কে দেবে এর উত্তর? সময় না কি অন্য কেউ? চর্চার দিনক্ষণ অতি নিকটে।

(লেখক কোলকাতার সাউথ সিটি (দিবা) কলেজের প্রাক্তন অধ্যক্ষ, রাষ্ট্রীয় বিদ্যা সরস্বতী পুরস্কার প্রাপ্ত বিশিষ্ট শিক্ষাব্রতী।)

শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতি

মজিবুর রহমান

বিভিন্ন পেশাজীবীদের আন্দোলনের সঙ্গে আমরা সবাই পরিচিত। দাবি দাওয়া আদায়ে সকল দেশে সকল যুগে কৃষক আন্দোলন, শ্রমিক আন্দোলন, শিক্ষক আন্দোলন, ছাত্র আন্দোলন সংগঠিত হতে দেখা গেছে। কিন্তু 'ছাত্র রাজনীতি' শধবন্ধ যেভাবে চালু রয়েছে সেভাবে শিক্ষক, শ্রমিক অথবা কৃষক-এর সাথে 'রাজনীতি'কে সংযুক্ত হতে দেখা যায় না। শিক্ষাঙ্গনে ছাত্র রাজনীতির গুরুত্বপূর্ণ অংশ 'ছাত্র সংসদ'। কলেজ-ইউনিভার্সিটির পড়ুয়ারা ছাত্র সংসদ গঠন করেন। ছাত্র রাজনীতি বেশ পুরনো ব্যাপার হলেও ছাত্র সংসদ গঠনের ইতিহাস তুলনামূলকভাবে নতুন বিষয়। ছাত্রসমাজ কর্তৃক শিক্ষা-সংস্কৃতি সংক্রান্ত ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে কর্মসূচি গ্রহণ ও কর্মকাণ্ড পরিচালনাকেই সাধারণভাবে ছাত্র রাজনীতি হিসেবে বিবেচনা করা হয়। শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের নানাবিধ বিষয় নিয়ে কলেজ-ইউনিভার্সিটি কর্তৃপক্ষের সঙ্গে আলোচনা এবং সরকারের দৃষ্টি আকর্ষণ ছাত্র রাজনীতির পরিচিত পরিসরের অন্তর্ভুক্ত। তবে ছাত্র রাজনীতিকে বৃহত্তর রাজনৈতিক ও সামাজিক কারণে রাজপথেও বিস্তার লাভ করতে দেখা যায় যদিও ছাত্র সংসদের কার্যক্রম সাধারণত সংশ্লিষ্ট কলেজ-ইউনিভার্সিটির মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। ছাত্র রাজনীতি কৈশোর ও তারুণ্যের ছেলেমেয়েদের মধ্যে গণতান্ত্রিক ভাবধারা ও মতাদর্শের ধারণা, নেতৃত্বদানের ক্ষমতা এবং রাজনৈতিক সচেতনতা সৃষ্টিতে সহায়তা করে।

বাংলায় ছাত্র রাজনীতির একটা উজ্জ্বল অতীত রয়েছে। ঊনবিংশ শতকের বিশ-তিরিশের দশকে হিন্দু (প্রেসিডেন্সি) কলেজের অধ্যাপক হেনরি লুই ভিভিয়ান ডিরোজিও (১৮০৯-১৮৩১) তাঁর অনুগামী একদল পড়ুয়া নিয়ে গঠন করেন ইয়ং বেঙ্গল। হিন্দু সম্প্রদায়ের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কার সাধনে ইয়ং বেঙ্গল আলোড়ন সৃষ্টিকারী ভূমিকা পালন করে। বিশ শতকের প্রথম পাদে বিপ্লবী তথা সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন, স্বদেশী আন্দোলন ও অসহযোগ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে ছাত্র রাজনীতি একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পরিগ্রহ করে। ১৯২৮ সালে কংগ্রেসের উদ্যোগে গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ ছাত্র সমিতি। ১৯৩২ সালে গঠিত হয় নিখিল বঙ্গ মুসলিম ছাত্র সমিতি। ১৯৩৬ সালে বামপন্থী ছাত্র সংগঠন সর্বভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের (এ আই এস এফ) গঠিত হয়। ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রামে ছাত্ররা সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনে ছাত্র সমাজ মুখর ছিল। ১৯৪৫-৪৬ সালে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বন্দি সেনাদের মুক্তির দাবিতে তারা পথে নামে। পুলিশের গুলিতে কয়েকজন পড়ুয়া প্রাণ হারান।

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালে পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্র লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্র সমাজ অবিস্মরণীয় ভূমিকা পালন করে। '৬২-এর শিক্ষা আন্দোলন, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান, '৭১-এর মুক্তিযুদ্ধেও ছাত্র সমাজের অংশগ্রহণ ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বাধীন বাংলাদেশে '৯০-এর স্বৈরাচার বিরোধী আন্দোলন, ২০১৩ সালের যুদ্ধাপরাধীদের ফাঁসির দাবিতে আন্দোলন, ২০১৮ সালের কোটা সংস্কার আন্দোলনে ছাত্র সমাজের ভূমিকা অনস্বীকার্য। ২০২৪ সালের জুলাই-আগস্টের গণঅভ্যুত্থানে ছাত্র সমাজই নেতৃত্ব দেয়। যে ছাত্র সমাজ শেখ মুজিবুর রহমানকে 'বঙ্গবন্ধু' বানিয়েছিল তারাই মুজিব কন্যা প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে দেশছাড়া করেছে। বাংলাদেশে বারবার ছাত্র রাজনীতিকে শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের গণ্ডি পেরিয়ে বৃহত্তর রাজনীতির নিয়ন্ত্রকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হতে দেখা গেছে। ছাত্রলীগ, ছাত্রদল, ছাত্র শিবির, ছাত্র ইউনিয়ন প্রভৃতি ছাত্র সংগঠন নিজ নিজ রাজনৈতিক দলের সবচেয়ে শক্তিশালী শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করে। একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, বাংলাদেশে ছাত্র রাজনীতির যেসব সাফল্য রয়েছে তা বিশ্বের আর কোনো দেশে নেই। পূর্ববঙ্গের ছাত্র রাজনীতির ঝাঁঝের সাথে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্র রাজনীতির ঝাঁঝ তুলনীয় নয়।

দেশভাগের সময় বাংলা বিভাজনের পর পশ্চিমবঙ্গে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের শাখা সংগঠন হিসেবে শ্রমিক, কৃষক, শিক্ষক, যুবদের মতো ছাত্র সংগঠনও গড়ে তোলা হয়। ছাত্র সংগঠন সংশ্লিষ্ট রাজনৈতিক দলের নেতা তৈরির সূতিকাগার হিসেবে দায়িত্ব পালন করে। কলেজ-ইউনিভার্সিটির অনেক ছাত্র নেতাই পরবর্তী সময়ে সাংসদ, বিধায়ক, মন্ত্রী ও দলের শীর্ষস্থানীয় নেতা হয়েছেন। ১৯৫৪ সালে মুখ্যমন্ত্রী বিধান চন্দ্র রায় ও বিশিষ্ট নেতা অতুল্য ঘোষের নেতৃত্বে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের পশ্চিমবঙ্গ শাখার উপাঙ্গ হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয় ছাত্র পরিষদ। ১৯৪৮ সালের এপ্রিলে প্রতিষ্ঠিত হয় ভারতের সমাজতান্ত্রিক ঐক্য কেন্দ্র (কমিউনিস্ট) যা এস ইউ সি আই (সি) নামে পরিচিত। দলের নেতা প্রভাস ঘোষ ১৯৫৪ সালের ডিসেম্বরে গঠন করেন সর্বভারতীয় গণতান্ত্রিক ছাত্র সংগঠন (এ আই

ডি এস ও)। ১৯৬৪ সালে সি পি আই ভেঙে সি পি আই (এম) গঠিত হয় আর তাদের ছাত্র শাখা ভারতের ছাত্র ফেডারেশন (এস এফ আই) গঠিত হয় ১৯৭০ সালে। প্রতিষ্ঠাতা সম্পাদক ছিলেন বিমান বসু। ১৯৯৮ সালের জানুয়ারিতে মমতা ব্যানার্জির নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস (টি এম সি) গঠিত হওয়ার পর আগস্ট মাসে গঠিত হয় তৃণমূল কংগ্রেস ছাত্র পরিষদ (টি এম সি পি)।

১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘের সঙ্গে সম্পৃক্ত অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (এবিভিপি) গঠিত হয় ১৯৪৯ সালে। এবিভিপি এখন ভারতীয় জনতা পার্টির শাখা সংগঠন হিসেবে কাজ করে। মূল ধারার রাজনৈতিক দলের পৃষ্ঠপোষকতাকে মূলধন করেই ছাত্র সংগঠনগুলো তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে। 'মাদার পার্টি'র নেতা ছাত্র সংগঠনের কাজকর্ম 'মনিটর' করেন।

এদিক থেকে দেখলে ছাত্র সংগঠনগুলোর স্বকীয় ভূমিকার যথেষ্ট অভাব রয়েছে। এজন্য দেখা যায়, দু'একটা ব্যতিক্রম ছাড়া, শাসকদল পাল্টালে কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদও পাল্টে যায়। শাসকদলের অনুগামী ছাত্র সংগঠন সংসদের দখল নেয়।

পশ্চিমবঙ্গে বিশ শতকের সাতের দশকে কিছু পড়ুয়া নকশাল আন্দোলনে যুক্ত হয়ে ক্যাম্পাস রাজনীতি এবং মূল ধারার রাজনীতিতে আলোড়ন সৃষ্টি করেন। ক্যাম্পাস ও রাজপথ রক্তাক্ত হয়ে ওঠে। বিগত দুই-তিন দশকে অধ্যক্ষ ও উপাচার্য ঘেরাওয়ের ঘটনা ঘটতে দেখা গেছে। পড়ুয়ারা উপাচার্যকে পদত্যাগ করতে বাধ্য করেছেন। তাঁরা নিজেদের মধ্যে মারপিট করে মাথা ফাটিয়েছেন, হাত-পা ভেঙেছেন। লোকসভা, বিধানসভা বা পঞ্চায়েত-পৌরসভার সাধারণ নির্বাচনকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে যে উত্তেজনা, কোন্দল, হিংসা ও হানাহানি চলে ছাত্র সংসদের নির্বাচনেও তার প্রতিফলন ঘটেছে। এখন ক্ষমতাসীন দলের নেতৃবৃন্দ যেমন চাকরির নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সাঙ্ঘাতিক দুর্নীতির সঙ্গে জড়িত থাকেন তেমনি তাদের ছাত্র নেতারা কলেজ-ইউনিভার্সিটিতে ভর্তি প্রক্রিয়ায় চরম অনিয়ম করেন। বহিরাগতরা ক্যাম্পাসে ঘোরাফেরা করেন। ছাত্র সংসদের অফিস শাসকদলের পার্টি অফিসে পরিণত হয়েছে। শিক্ষাঙ্গনে বিশৃঙ্খলা বিরাজ করছে। পড়াশোনার সুস্থ পরিবেশ থাকছে না।

বেসরকারি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র রাজনীতির অস্তিত্ব নেই। সরকারি কলেজ-ইউনিভার্সিটি থেকেও ক্যাম্পাস রাজনীতিকে বিদায় জানানোর জোরদার দাবি রয়েছে। যারা ক্যাম্পাস রাজনীতির অবসান চান তাঁদের বক্তব্য হলো, ছাত্রছাত্রীরা শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আসেন পড়াশোনা করতে, রাজনীতি করতে নয়। ছাত্র সংসদের নির্বাচনকে ঘিরে উত্তেজনা ও অশান্তির জেরে ক্যাম্পাসের পরিবেশ নষ্ট হয় এবং পঠনপাঠন বিঘ্নিত হয়। ইউ পি এ জমানার জে এম লিংডো কমিটি এবং এন ডি এ জমানার টি এস আর সুব্রহ্মণ্যম কমিটি ছাত্র রাজনীতি বন্ধের সুপারিশ করে। দেশের সর্বোচ্চ আদালত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ছাত্র সংসদের কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করার কথা বলে। পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন রাজ্যপাল তথা বিজেপির নেতা কেশরীনাথ ত্রিপাঠী কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়কে রাজনীতিমুক্ত করার আহ্বান জানিয়েছিলেন। অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন প্রাক্তন উপরাষ্ট্রপতি তথা বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি বেঙ্কাইয়া নাইডু। পশ্চিমবঙ্গ সরকার গত কয়েক বছর ধরে সমস্ত কলেজ-ইউনিভার্সিটির ছাত্র সংসদ নির্বাচন বন্ধ রেখেছে।

'ছাত্রনাং অধ্যয়নাং তপঃ' প্রবাদটি স্কুল ছাত্রদের ক্ষেত্রে যতটা প্রযোজ্য কলেজ-ইউনিভার্সিটির পড়ুয়াদের জন্য ততটা নয়। উচ্চশিক্ষা পড়া মুখস্থ করার জায়গা হওয়া উচিত নয়। শুধুমাত্র নিজের 'ক্যারিয়ার' নিয়ে ব্যস্ত ও চিন্তিত থাকা একধরনের স্বার্থপরতা। কাজী নজরুল ইসলাম যে 'ছাত্রদলের গান' গেয়েছেন তাকে অবদমিত করা যায় না।

সুকান্ত ভট্টাচার্যের 'আঠারো বছর বয়স'কে 'লক্ষ্মণ রেখা' দিয়ে আটক রাখা যায় না। উচ্চশিক্ষার শিক্ষার্থীরা রাষ্ট্রিক ও সামাজিক বিষয় নিয়ে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকতে পারেন না। তাঁদের জ্বলন্ত ও জরুরি বিষয় নিয়ে মতামত গঠন ও প্রকাশ করতে হবে। রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দই রাষ্ট্র পরিচালনা করেন। সেই রাজনীতির প্রাথমিক পাঠ ছাত্র জীবনে পেলে তো ভালোই! পড়াশোনা নিশ্চয়ই প্রায়োরিটি পাবে কিন্তু শিক্ষা বহির্ভূত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় নিয়েও প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করতে হবে। এই দুইয়ের মধ্যে একটা ভারসাম্য রক্ষা করলেই হল। ছাত্র রাজনীতি করেছেন আবার লেখাপড়াটাও সাফল্যের সঙ্গে শেষ করেছেন এমন অজস্র উদাহরণ রয়েছে।

প্রতিষ্ঠানগতভাবে যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়, প্রেসিডেন্সি কলেজ (বিশ্ববিদ্যালয়), দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়, হায়দ্রাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র রাজনীতির একটা ঐতিহ্য আছে। লেখাপড়ার গুণগত মানের দিক থেকেও এগুলো দেশের অগ্রগণ্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠান হিসেবে স্বীকৃত।

শিক্ষা ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ স্টেকহোল্ডার হলেন শিক্ষার্থীরা। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থায় তাঁদের প্রতিনিধিত্ব কোনোভাবেই উপেক্ষা করা যায় না। তাঁদের সুবিধা অসুবিধার কথা বলার সুযোগ ও অধিকার অবশ্যই থাকা দরকার। কিছু শিক্ষার্থীর উচ্ছৃঙ্খলতার দোহাই দিয়ে ছাত্র সংসদকেই অকার্যকর করে দেওয়ার কোনো মানে হয় না। শিক্ষার্থীদের একটু আধটু অনিয়ন্ত্রিত উচ্ছ্বাস ও ভুল-ভ্রান্তিকে সাঙ্ঘাতিক অপরাধ বিবেচনা করলে চলবে না। ছাত্র রাজনীতি ও ছাত্র সংসদের বৈধতাকে হঠাৎ অস্বীকার করা কোনো ন্যায় সঙ্গত পদক্ষেপ হতে পারে না। ছাত্র রাজনীতি বিলুপ্ত হলে শিক্ষাঙ্গনে প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হবে না। সেক্ষেত্রে সরকার ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তাদের পক্ষে শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের স্বার্থ বিরোধী পদক্ষেপ গ্রহণ ও রূপায়ণ সহজ হবে। উচ্চশিক্ষার বেসরকারিকরণ ত্বরান্বিত হবে। আর্থিকভাবে অস্বচ্ছল ছেলেমেয়েদের জন্য উচ্চশিক্ষার দ্বার বন্ধ হবে। ধনতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ধ্বজাধারীরা হয়তো সেটাই চাইছেন।

লেখক মুর্শিদাবাদ জেলার কাবিলপুর হাই স্কুলের প্রধান শিক্ষক।

স্মরণ

হরিমাধব মুখোপাধ্যায়

(১৯৪১-২০২৫)

প্রখ্যাত নাট্যকার, নির্দেশক, সংগঠক, অধ্যাপক হরিমাধব মুখোপাধ্যায় প্রয়াত হলেন ২৪ মার্চ সোমবার রাতে। দক্ষিণ কলকাতার একটি হাসপাতালে তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন। মৃত্যুকালে বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর। হরিমাধবের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গী ভাবে জড়িয়ে ছিল বালুরঘাট।

১৯৪১-এর ৩ এপ্রিল বালুরঘাটেই জন্ম তাঁর। ছোটবেলা থেকেই ছিলনাটকেরপ্রতি অমোঘ আকর্ষণ। কিশোর বয়সে বন্ধুদের নিয়ে তৈরি করেন নাট্যদল 'তরুণতীর্থ'। মঞ্চস্থ করেছিলেন আগাথা ক্রিস্টির উপন্যাস অবলম্বনে তাঁর লেখা নাটক 'দশ পুতুল'। কলেজ জীবন কেটেছে কলকাতায়। সেখানে কয়েক বছরের চাকরি জীবনে নাট্যচর্চায় সমৃদ্ধ হয়েছিলেন। ১৯৬৭ সাল নাগাদ বালুরঘাটে ফিরে শিক্ষকতা শুরু করেন হরিমাধব। ১৯৬৯-এ প্রতিষ্ঠা করেন নাট্যদল 'ত্রিতীর্থ'। শুধু অভিনয় বা নাটক নির্দেশনাই নয়, সঙ্গীত পরিচালনা, মঞ্চসজ্জার দায়িত্বও সামলাতেন তিনি। তাঁর বাবা ছিলেন পেশাদার কীর্তন গাইয়ে। বাড়িতে নিয়মিত ছিল গানের চর্চা। এক স্মৃতিচারণায় তিনি বলেছিলেন, 'আসলে আমি নিজে কখনও গান গাওয়া শিখিনি, তাই সেই অর্থে সঙ্গীতের ব্যাকরণ শিখিনি। কিন্তু আমি একটা সঙ্গীতের আবহ ও পরম্পরার মধ্যে বড় হয়েছি।'

নানা সময়ে জেলা ও জেলার বাইরে এবং কলকাতায় বহু নাট্য সংস্থা তাঁকে সম্মানিত করেছে। পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তথ্য ও জনসংযোগ বিভাগের তরফে তাঁর 'দেবাংশী' নাটককে শ্রেষ্ঠ প্রযোজনার পুরস্কারে পুরষ্কৃত করা হয়। 'দেবীগর্জন' নাটকের জন্য তিনি 'দিশারী' পুরস্কার পান। নান্দীকার জাতীয় নাট্যমেলাতেও তিনি সম্মানিত হন। রায়গঞ্জ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পান 'ডিলিট' উপাধি। এ ছাড়াও পেয়েছেন 'সঙ্গীত নাটক অ্যাকাডেমি'র পুরস্কার এবং 'বঙ্গভূষণ' সম্মান। তিনি বলতেন, 'নাটকই একমাত্র মাধ্যম যেখানে দর্শকের সঙ্গে অভিনেতার আবেগ সঞ্চারিত হয়।'

মহাশ্বেতা দেবীর লেখা 'জল' গল্পটি পুরুলিয়ার স্থানীয় ভাষায় নাট্যরূপ দেন তিনি। ফ্রিডরিক ড্যুরান মাটের একাঙ্ক নাটক 'ইনসিডেন্ট অফ আ টুইলাইট' অবলম্বনে লিখেছিলেন 'গোধূলিবেলায়'। তা সম্প্রচারিত হয়েছিল দূরদর্শনে। উত্তরবঙ্গে তেভাগা আন্দোলনের আঁচ এবং সেখানকারই এক পুলিশ অফিসারের অভিজ্ঞতা শুনে লেখেন 'মন্ত্রশক্তি' নাটক। যার মূল কাঠামো ছিল স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের লেখা একটি ছোটগল্প। শেষ মঞ্চাভিনয় ২০১৭-য়, রাজবংশী ভাষায় রচিত 'রক্তকরবী' নাটকে। ২০১৮, এ 'বন্দুক' নাটকে শেষবারের মতো নির্দেশনার কাজ করেন।

বিভিন্ন নাট্যদলে তাঁর নির্দেশিত ও অভিনীত নাটক গুলি হল পাপ ও পাপী, আক্কেল সেলামি, বন্দিবীর, ছেঁড়া কাগজের ঝুড়ি, পাখির বাসা, নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র, রজনীগন্ধা, চারপ্রহর, ছায়ানায়িকা, পুতুল খেলা, বৃষ্টি বৃষ্টি, বিশে জুন, ছুটির খেলা, তিন বিজ্ঞানী, জল, বিছন , চিরকুমার সভা, দেবীগর্জন, মন্ত্রশক্তি প্রভৃতি। তাঁর স্বরচিত নাটকগুলির মধ্যে রয়েছে ক্রিস্টির কাহিনি অবলম্বনে দশ পুতুল এবং চেকভের কাহিনি অবলম্বনে বহ্বারম্ভ। এ ছাড়াও রয়েছে শিশুপাল, অনিকেত, বিছন, খারিজ, মাতৃতান্ত্রিক, নিকট গঙ্গা, দেবাংশী , ক্ষীরের পুতুল প্রভৃতি।

কুমুদিনী হাজং

আলী আকবর তাবি

চলে গেলেন টংক আন্দোলনের প্রবাদপ্রতিম নেত্রী কুমুদিনী হাজং। রেখে গেলেন হার না মানা সংগ্রামের রক্তক্ষয়ী দীর্ঘ ইতিহাস।

গত ২ মার্চ নিজ বাড়ি নেত্রকোনার বিরিশিরিতে তিনি শেষনিশ্বাস ত্যাগ করেন। ২০১৯ সালে বিরিশিরিতে কুমুদিনী হাজংয়ের বাড়ির উঠোনে আলাপচারিতায় ঐতিহাসিক টংক আন্দোলন সম্পর্কে যা জেনেছিলাম তার অংশবিশেষ নিচে উদ্বৃত হলো-

ব্রিটিশ এবং জমিদাররা মিলে টংক প্রথা চালু করে। টংক প্রথা হলো টাকার পরিবর্তে উৎপন্ন ফসল দ্বারা জমিদারের খাজনা পরিশোধ করা, যা ছিল কৃষককে নিঃস্ব করণের এক নির্মম প্রক্রিয়া। ১৯৩৭ সালে জমিদারের ভাগ্নে কমরেড মনিসিংহের নেতৃত্বে হাজং সম্প্রদায় এ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায়।

১৯৪৬ সালের ১লা জানুয়ারি দুর্গাপুর থানার বিরিশিরিতে ইস্টার্ন ফ্রন্টিয়ার রাইফেল বাহিনীর সেনারা টংক আন্দোলন দমনের নামে টংক আন্দোলনের নেত্রী কুমুদিনী হাজংকে বাড়ি থেকে উঠিয়ে ক্যাম্পে নিয়ে সম্ভ্রমহানির চেষ্টা করে। কিন্তু সেই মুহূর্তে গ্রামবাসী খবর পেয়ে তীর, ধনুক, বল্লম ও রামদা নিয়ে সেনা ক্যাম্প ঘিরে ফেলে।

রাশমনি হাজংসহ ১২ জনের একটি সশস্ত্র মহিলা দল কুমুদিনী হাজংকে ছাড়াতে সেনা ক্যাম্পে ঢুকে পড়লে সেনারা গুলি করে রাশমনিকে নির্মমভাবে হত্যা করে। রাশমনিকে রক্ষা করতে সুরেন্দ্র হাজং গুলিবিদ্ধ হয়ে মারা যান। সেদিন হাজংদের সাথে সম্মুখ যুদ্ধে দু'জন সেনাও নিহত হয়। বাকি সেনারা পালিয়ে জীবন রক্ষা করে।

রাশমনি জীবন দিয়ে কুমুদিনী হাজংয়ের সম্ভ্রম রক্ষা করেন আর কুমুদিনী হাজং তারপর বয়ে বেড়িয়েছেন অতীতের দুঃসহ স্মৃতি। রাশমনির মৃত্যুতে কাতর হয়ে তাঁর স্বামী পাঞ্জী হাজং আগুনে আত্মাহুতি দেন। পরবর্তিতে কুমুদিনী হাজং হয়ে উঠেছিলেন টংক আন্দোলনের প্রেরণার উৎস।

স্বাধীনতা সংগ্রামে হিন্দুত্ববাদী শক্তির ভূমিকা

শান্তনু দত্ত চৌধুরী

---

(২)

কংগ্রেসের পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গ্রহণ ও আর. এস. এস.

১৯২৯ সালে লাহৌর কংগ্রেস অধিবেশনে পূর্ণ স্বাধীনতার প্রস্তাব গৃহীত হয়।সিদ্ধান্ত হয় ২৬ জানুয়ারি তারিখটি প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবসরূপে পালিত হবে।ওই দিন দেশব্যাপী সভা সমাবেশ হবে। সর্বত্র জাতীয় পতাকা উত্তোলন করা হবে।সাফাই, সূত্রযজ্ঞ ,অস্পৃশ্যতা বিরোধী কর্মসূচি পালিত হবে।আর.এস.এস প্রধান ডাক্তার সাহেব জানান আর.এস.এস এই কর্মসূচিতে যোগ দেবে না।তবে ব্যাক্তিগতভাবে সংঘের কোনও সদস্য চাইলে নিজ বাড়িতে ওই ভাগোয়া ঝানডা তুলতেপারেন,তেরঙ্গা পতাকা নয়।২৬ জানুয়ারি তারিখটি বর্তমানে প্রজাতন্ত্র দিবসরূপে পালিত হয়।পরাধীন ভারতে ওই দিনটি পালন করতে গিয়ে সাধারণ মানুষকে দমন পীড়ন সহ্য করতে হত।

১৯৩০-১৯৩১ লবণ আইন অমান্য আন্দোলন ও ১৯৩২ এর আইন অমান্য আন্দোলনে সংঘ পরিবার যোগ দেবেনা বলে ডাক্তার সাহেব জানিয়ে দিয়েছিলেন। তবে তিনি বলেন কোনও সদস্য ব্যক্তিগত ভাবে চাইলে এই আন্দোলনে যোগ দিতে পারেন। আর.এস.এস এর ইতিহাসকার সি.পি.ভিসিকার লিখেছেন ডাক্তার সাহেব হিন্দুদের ও হিন্দু সংগঠনগুলিকে ঐক্যবদ্ধ হবার জন্য বারবার বলছেন, কিন্ত ব্রিটিশশাসন সম্পর্কে তিনি বরাবরই নীরব ছিলেন। ১৯৩৪ সালে সংঘের একটি গুরুত্বপূর্ণ অধিবেশনে তিনি হিটলারও মুসোলিনিরপথ অনুসরণ করার কথা বলেন। ডা.মুনজে তাঁকে সমর্থন করেন।

১৯৩৩ সালে কংগ্রেসের প্রবীণ গান্ধিবাদী নেতা যমুনালাল বাজাজ ডা. হেডগেওয়ারের কাছে বিভিন্ন প্রশ্নে সংঘের কি মনোভাব তা জানতে চান।ডাক্তার সাহেব অবশ্য যমুনালালজির সঙ্গে দেখা করে তাদের সম্পর্কে যে সব অভিযোগ উঠেছিল ও সন্দেহ দেখা দিয়েছিল তার দুর করার চেষ্টা করেন। কিন্তু ১৯৩৪ সালে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে কংগ্রেস সদস্যদের হিন্দু মহাসভা,মুসলিম লিগও আর.এস.এস-এর সদস্য হওয়া নিষিদ্ধ করে। কারণ এই ৩ টি সংগঠনই ধর্মের ভিত্তিতে মানুষকে বিভক্ত করার জন্য সাম্প্রদায়িক প্রচার চালাচ্ছিল।

বাংলার গুপ্ত বিপ্লববাদী আন্দোলনের বিখ্যাত নেতা ত্রৈলোক্যনাথ চক্রবর্তী মহারাজ তাঁর ' জেলে ত্রিশ বছর ও পাক ভারতের স্বাধীনতা ' গ্রন্থে লিখেছেন, তিনি ও বাংলার বিপ্লববাদী আন্দোলনের বিরাট সংখ্যক সংগঠক ১৯৩৯ সালে গান্ধিজির হস্তক্ষেপে জেল থেকে মুক্তি পান ও পুনরায় আত্মগোপন করেন। গান্ধিজি তাঁদের বলেছিলেন তিনি শীঘ্রই চূড়ান্ত সংগ্রামের ডাক দেবেন।মহারাজ তাঁদের সংগঠনের সঙ্গে যোগাযোগ করতে বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে নাগপুরে এসে উপস্থিত হন। এখানেই সংঘের সদর দপ্তর। কলকাতায় মহারাজের এক সম্পর্কিত ভাই ছিলেন ডা.হেডগেওয়াড়ের সহপাঠী। তখন ডাক্তার সাহেব তাঁর সঙ্গে মাঝে মধ্যে ও অনুশীলন সমিতির কেন্দ্রে আসতেন। তিনি ত্রৈলোক্যনাথকে খুবই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি মহারাজকে জানিয়ে দেন যে ব্রিটিশ বিরোধী কোনো সংগ্রামে আর.এস. এস যোগ দেবে না।

মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর

সংঘের জীবনে অপরিসীম প্রভাব বিস্তার করেন দ্বিতীয় সরসংঘ চালক মাধব সদাশিবরাও গোলওয়ালকর। ১৯৪০ সালে ডাক্তার সাহেবের প্রয়াণের পর তিনিই সংঘ প্রধান হন। তাঁকে সংঘের সদস্যরা 'পূজনীয় গুরুজি' বলে উল্লেখ করেন। আগস্ট আন্দোলনের সময় গুরুজি সাফল্যের সঙ্গে সংঘের স্বয়ং সেবকরা যাতে কোনো ব্রিটিশ বিরোধী। সংগ্রাম ও আন্দোলনে যোগ না দেন সে বিষয়ে নজর রেখেছিলেন। ব্রিটিশ ইন্টেলিজেন্স অত্যন্ত সন্তোষের সঙ্গে তাদের রিপোর্টে বলছে ' আর.এস.এস ও হিন্দু মহাসভা কোনও রকম আন্দোলনে যোগ দেয়নি।তারা আইন মেনে চলছে এবং সরকারের সঙ্গে সহযোগিতা করছে।' আগস্ট আন্দোলনের সময় ১৯৪৩ সালে (বাংলা সন ১৩৫০) বাংলায় ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ হয়। এই দুর্ভিক্ষ সম্পর্কে গোলওয়ালকর যা বলেন তা যথেষ্ট চিত্তাকর্ষক। তিনি বলেছিলেন 'এই দুর্ভিক্ষ ও তার পরিণতির জন্য সংঘ কাউকে দায়ী করতে চায়না। যখন জনসাধারণ এই সবঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করতে চায় তখন তাদের যে দুর্বলতা আছে তা ফুটে ওঠে। দুর্বলের প্রতি সবলের যে অবিচার তার জন্য সবলকে দায়ী করার কোনও অর্থ হয়না। এটি একটি ব্যর্থ প্রচেষ্টা। সংঘ (আরএসএস) অন্যদের (পড়ুন ব্রিটিশ সরকার) সমালোচনা করে তাদের মূল্যবান সময় নস্ট করতে চায় না। আমরা যদি জেনে থাকি যে প্রকৃতির রাজ্যে এটাই নিয়ম যে বড়মাছ ছোট মাছকে খাবে, তখন বড় মাছের ওপর দোষ চাপানো এক রকম বাতুলতা। প্রকৃতির নিয়ম (Law of Nature) তা ভালো খারাপ যাই হোকতা সবযুগেই সত্য। এই নিয়মকেবেঠিক (Unjust) বলেপরিবর্তনকরা যায়না।' মজুতদার, কালোবাজারি ও তাদের পৃষ্ঠপোষক ব্রিটিশ সরকার সম্পর্কে এই ছিল গোলওয়ালকর ও সংঘের দৃষ্টিভঙ্গি।

স্বাধীনতার অব্যবহিত পর ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর থেকে গান্ধিজির হত্যাকাণ্ডের (৩০ জানুয়ারি, ১৯৪৮) মধ্যের সময়ে গান্ধীজির সঙ্গে গোলওয়ালকরের দুবার সাক্ষাৎ হয়। সেপ্টেম্বরে দিল্লিতেও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়।গান্ধিজি ১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বরের দ্বিতীয় সপ্তাহে কলকাতা থেকে দিল্লীতে আসেন। গোলওয়ালকর ১২ তারিখ গান্ধিজির সঙ্গে দেখা করেন।ওই সাক্ষাৎ প্রসঙ্গে বহুদিন পর ১৯৬৯ সালে গান্ধিজির জন্ম শতবার্ষিকীর সময় গোলওয়ালকর বলেন ' সেই সময় (১৯৪৭ এর সেপ্টেম্বর) দিল্লীতে দাঙ্গা হচ্ছিল। গান্ধিজি আমায়

বললেন‘দেখো কী হচ্ছে‘। আমি বললাম ‘ এ আমাদের দূর্ভাগ্য। বৃটিশরা বলে যে আমরা যখন থাকবো না ,চলেযাবো তখন তোমরা পরস্পরের গলার নলি কাটবে। আজতাই হচ্ছে। সারা পৃথিবীতে আমাদের সুনাম নষ্ট হচ্ছে।’ সেদিনের বিকালের প্রার্থনা সভায় গান্ধিজি গর্বের সঙ্গে আমার নাম নেন ও আমার চিন্তার কথাবলেন।’

গোলওয়ালকরের উপরোক্ত বক্তব্য সম্পর্কে প্রকৃত ভাষ্য কী ? গান্ধিজি ও সর্দার প্যাটেলের জীবনীকার রাজমোহন গান্ধি ওই সাক্ষাৎকার সম্পর্কে লিখেছেন। তিনি , গান্ধিজি ওই দিন ১২/০৯/১৯৪৭ এ বিকালের প্রার্থনা সভায় নিজে কী বলেছিলেন তা ‘ হরিজন ‘ পত্রিকার ২১ সেপ্টেম্বর,১৯৪৭ সংখ্যা থেকে হুবহু তুলে দিয়েছিলেন। গান্ধিজি বলেন ‘ আমি তাঁকে (গোলওয়ালকর) বলেছি ‘ আর এস এস - এর হাত রক্তরঞ্জিত । গুরুজি আমায় বলেছেন ‘একথা সত্য নয় ।তার সংগঠন মুসলমানদের হত্যা করার পক্ষে নয়। তারা সর্বশক্তি দিয়ে হিন্দুধর্মকে রক্ষা করতে চায়। তারা শান্তির পক্ষে এবং সে আমাকে (গান্ধিজিকে) বলেছে আমি তা প্রকাশ্যে ঘোষণা করতে পারি ।ক্ষুব্ধ গান্ধিজি তাঁকে বলেছিলেন , এই বিবৃতি তোমার পক্ষ থেকেই দেওয়া উচিৎ ।’

রাজমোহন গান্ধি উপরোক্ত বিষয়ে আরও একজনের সাক্ষ্যের কথা উল্লেখ করেছেন। তিনি হচ্ছেন ব্রিজকৃষ্ণ চান্ডিওয়ালা। ইনি দিল্লির সেন্ট স্টিফেনস কলেজের ছাত্র ছিলেন। ১৯২০ সালে অসহযোগ আন্দোলনের সময় কলেজ ত্যাগ করেন। তারপর থেকেই সে গান্ধিজির ছায়াসঙ্গী। কৃষ্ণ লিখেছেন, যখন গোলওয়ালকর বাপুকে বলেন, আর এস এস মুসলমানদের হত্যা করার পক্ষে নয়, বাপু তাঁকে বলেন, ‘একথা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর।’ গোলওয়ালকর বাপুকে বলেন, ‘আপনি আমার নাম উল্লেখ করে একথা বলতে পারেন।’ বাপু তাঁকে বলেন, ‘এই বিবৃতি তোমার পক্ষ থেকেই দেওয়া উচিত ।ক্ষুব্ধ গান্ধিজি নিহত হবার পর আর এস এসকে বেআইনি ঘোষণা করা হয় । ১৯৪৮ -এর ২৭ অক্টোবর নেহরু প্যাটেলকে লেখেন, সেই সময় বাপু তাঁকে বলেছিলেন তিনি গোলওয়ালকরের কথায় বিশ্বাস করেন না।

গান্ধিজি ওই আলোচনার চারদিন পর ১৬ সেপ্টেম্বর,১৯৪৭-এ দিল্লির বাল্মীকি কলোনিতে আর এস এস-এর কর্মীদের এক সভায় ভাষণ নেন।এই মিটিংটি সম্পর্কে ‘হরিজন’ পত্রিকায় ও গান্ধিজির সচিব প্যারেলাল নায়ার লিখিত ‘দি লাস্ট ফেজ’ এবং ব্রিজকৃষ্ণের ডায়েরিতে যা পাওয়া গিয়েছে তা এইরকম --

গান্ধিজি আর এস এস কর্মীদের বলেন, ‘অনেক বছর আগে আমি আর এস এস-এর শিবির পরিদর্শন করে তাদের শৃঙ্খলা, জীবনযাত্রার সারল্য ও অস্পৃশ্যতার অনুপস্থিতি দেখে খুবই খুশি হয়েছিলাম। কিন্তু মনোভাবের মধ্যে শুদ্ধতা ও প্রকৃত জ্ঞান ছাড়া আত্মত্যাগ সমাজের ঐক্য রক্ষার জন্য সহায়ক তা প্রমাণ করতে হয়। একজন সংঘ কর্মী প্রশ্ন করেন, ‘হিন্দুধর্ম কি একজন খারাপ কাজ করেছে এমন ব্যক্তিকে হত্যা করা অনুমোদন করে না।’ উত্তর গান্ধিজি বলেন, ‘একজন পাপী ব্যক্তি কী করে আরেকজন পাপীকে বিচার বা হত্যা করার অধিকার দাবি করে।’ গান্ধিজি বলেন, সঠিক পদ্ধতিতে গঠিত কোনও সরকারই কেবল আইন অনুযায়ী পাপীর বিচার করতে পারে। তিনি নেহরু ও প্যাটেল সম্পর্কে বলেন, ‘ এঁরা দুজনেই দীর্ঘ দিনের সহকর্মী ও তাদের লক্ষ্য এক। তোমরা যদি নিজেদের হাতে আইন ও বিচার ও শাস্তি দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে নাও তাহলে তো তারা ক্ষমতাহীন ও কর্মহীন হয়ে পড়বে। নিজেদের হাতে ক্ষমতা ও আইন তুলে নিয়ে এইভাবে অন্তর্ঘাত সৃষ্টি কোরো না।’ তিনি মনে করিয়ে দেন হিন্দুধর্ম ‘ বর্জন ‘ করার ধর্ম নয় ।এই ধর্ম সকলকে গ্রহণ করার কথা বলে।’ এরপর গান্ধিজি যা বলেন তা আজকের দিনেও প্রযোজ্য। তিনি বলেন ‘ বিরাট সংখ্যক হিন্দু যদি ভুল পথে পরিচালিত হয় তাহলে কেউই হয়তো তাদের নিবৃত্ত করতে পারবেনা ।কিন্তু তাও একজন ব্যক্তিরও অধিকার আছে এর বিরুদ্ধে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত করার। যা আমি এখন করছি।’

সেপ্টেম্বর থেকে (১৯৪৭) আর এস-এর পক্ষ থেকে তাদের বিভিন্ন সভা সমাবেশে উত্তেজনাপূর্ণ বিরোধী সম্প্রদায়িক বক্তব্য প্রচার করা হয়। একই সঙ্গে প্রচার চালানো হয় মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরুর বিরুদ্ধে। এদের মুখপত্র Organiser-এ গান্ধিজি সম্পর্কে বলা হয় তিনি রোম সম্রাট নীরো। যখন রোম জ্বলছিল তখন সম্রাট নীরো বীণা বাজাচ্ছিলেন। গান্ধিজি যখন হিন্দুরা আক্রান্ত তখন শান্তির বাণী বর্ষণ করছেন। গান্ধিজি তাঁর কলকাতা অবস্থানের (আগস্ট ১০ -সেপ্টেম্বরের ৫ তারিখ পর্যন্ত , ১৯৪৭) সময় সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি ও শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য যে চেষ্টা চালাচ্ছিলেন তাকে তীব্র ভাষায় আক্রমণ করা হয়। ডিসেম্বরের ৭ তারিখ দিল্লি রামলীলা ময়দানে আর এস এস-এর বার্ষিক অনুষ্ঠানে গোলওয়ালকর আবার দীর্ঘ জ্বালাময়ী ভাষণ দেন। তিনি সংঘের শক্তি কীভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে সে বিষয়ে আত্মপ্রশস্তিমূলক বিবরণ দেন। তিনি বলেন, সংঘের শক্তি দেখে সবাই বিস্মিত হচ্ছে। পরের দিন সন্ধ্যায় রোটক রোডে দুহাজার নেতৃস্থানীয় আর এস এস ক্যাডারের সভায় গোলওয়ালকর বলেন, ‘আমাদের ছত্রপতি শিবাজীর মতন গেরিলা যুদ্ধ করার প্রস্তুতি নিতে হবে। যতক্ষণ না পাকিস্তানকে শেষ করা হচ্ছে আমাদের থামানো যাবে না। নেহরু সরকার আমাদের ঠেকাতে পারবে না।’ ওই সভা সম্পর্কে পুলিশ রিপোর্ট বলছে গোলওয়ালকর বলেন, ‘পৃথিবীতে কোনও শক্তি নেই যারা মুসলমানদের ভারতে রাখতে পারে। তাদের এই দেশ ছাড়তে হবে।

মহাত্মা গান্ধি ভোটের জন্য মুসলমানদের এদেশে রাখতে চান। কিন্তু নির্বাচনের আগেই তাদের এই দেশ ছাড়তে হবে ।মহাত্মা গান্ধি আর তাদের বিভ্রান্ত করতে পারবেনা। সরসংঘচালক গুরুজি জানিয়ে দেন যে,আমাদের হাতে এমন মাধ্যম আছে যার দ্বারা এই ধরনের লোকদের অবিলম্বে নিশ্চুপ করিয়ে দিতে পারি। কিন্তু আমাদের ঐতিহ্য হিন্দুদের প্রতি শত্রু মনোভাবাপন্ন না হওয়া। তবে যদি আমরা বাধ্য হই, তাহলে আমরা সেই পথ গ্রহণ করতেও পিছপা হব না।’ (কর্তার সিং ইন্সপক্টের, সিলাইডি-র রিপোর্ট। ৭-৯ ডিসেম্বর, ১৯৪৭)।

দিল্লিতে ১৯৪৭-এর দ্বিতীয়ার্ধে এক কুৎসিত পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল। পাঞ্জাবের দাঙ্গা, ছিন্নমূল উদ্বাস্তুদের এপারে আসা, তাদের মর্মন্তুদ কাহিনীকে একতরফা প্রচারের কাজে লাগিয়ে সংঘের বিষাক্ত সাম্প্রদায়িক প্রচার, পরিস্থিতি জটিল করে তোলে। এই পরিস্থিতিতে গোলওয়ালকর ও আর এস এস মহাত্মা গান্ধি ও পণ্ডিত নেহরু যারা এই দেশকে একটি ধর্মান্ধ হিন্দুরাষ্ট্রে পরিণত করার পথে প্রধান প্রতিবন্ধক ছিলেন তাদের 'অবিলম্বে নিশ্চুপ করে দেওয়া'র কথা চিন্তা করেছিল।

এরপর ১৯৪৮ এর ৩০ জানুয়ারি কী হয়েছিল সকলেই জানেন। এই হচ্ছে হিন্দুত্ববাদীদের স্বাধীনতা সংগ্রামে অবদান।

ঔরঙ্গজেবের সমাধি ধ্বংস করার চেষ্টা-- সঙ্ঘ পরিবারের অপদার্থতা ঢাকবার কৌশল

অমিতাভ সিংহ

গত কয়েকদিন মহারাষ্ট্রর নাগপুরের কাছে ঔরঙ্গাবাদ জেলার খুলদাবাদে যেখানে মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের সমাধি রয়েছে তা সরিয়ে নেওয়ার দাবিতে হিন্দুত্ববাদী শক্তি খেপে উঠেছে। বর্তমান ছত্রপতি সম্ভাজিনগর জেলায় (পূর্বতন আওরঙ্গবাদ জেলা) অবস্থিত সমাধিটি ভেঙে ফেলার নিদান দিয়েছিলেন বিজেপি সাংসদ উদয়রাজ ভোঁসলে। তার প্রতিক্রিয়ায় নাগপুরে বড়রকমের অশান্তি ধরপাকড় দেখা গেল।

খুলদাবাদে বাদশা ঔরঙ্গজেবের সমাধিটি খোলা আকাশের নীচে অবস্থিত। এর ওপর কোনো আচ্ছাদান নেই। নেই কোনো মাজার বা মসজিদ বা সমাঝি সৌধ। বাদশা নিজে বলে গিয়েছিলেন যে তাঁর সমাধির ওপর যেন কোনও স্ট্রাকচার না করা হয়। খোদাতালার আশীষ এবং দর্শনার্থীদের পায়ের ধুলো যেনো তাঁর কবরস্থানের ওপর সঞ্চিত হয়। বহু বছর পর হায়দরাবাদের নিজাম একটি শ্বেত পাথরের রেলিং দিয়ে কবর স্থানটি ঘিরে ওর পাশে একটি মসজিদ বানিয়ে দেন।

বিতর্কের সূত্রপাত ভিকি কৌশলের 'ছাওয়া' নামে একটি বলিউড চলচিত্রে শিবাজিপুত্র শম্ভাজি ও মোগল সম্রাট ঔরঙ্গজেবের লড়াইকে কেন্দ্র করে। এই সিনেমায় শম্ভাজিকে এক বীর, ধর্মপ্রাণ হিন্দু অপরাজেয় জননায়ক হিসাবে দেখানো হয়েছে।অন্যদিকে ঔরঙ্গজেবকে এক খল , ধর্মোন্মাদ ও নিষ্ঠুর চরিত্র হিসাবে উপস্থাপনা করেছেন পরিচালক।

এইসূত্রে মারাঠি অস্মিতা জাগিয়ে তোলার দায়িত্ব নিয়েছেন বিজেপি শিবসেনা জোটের একাধিক মন্ত্রী ও নেতা। রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী পর্যন্ত বিদ্বেষ যজ্ঞে আগুন দিলেন এই বলে, তিনিও চান না এই সমাধি তার রাজ্যে থাকুক। কিন্তু এই সমাধিটি বর্তমানে আর্কিওলজিক্যাল সার্ভে অব ইন্ডিয়ার তত্ত্বাবধানে রয়েছে তাই হয়তো এখনও তারা তা ভেঙে গুঁড়িয়ে দিতে পারেন নি। যোগীই বা পেছিয়ে থাকবেন কেন? হিন্দুত্ববাদের নয়া আইকন হুঙ্কার ছাড়লেন যারা ঔরঙ্গজেবকে আদর্শ মনে করেন তাদের দেশে থাকার কি অধিকার আছে? নাগপুরে ঔরঙ্গজেবের কুশপুত্তলিকা সবুজ কাপড়ে মুড়ে দাহ করা হল। গুজব রটল এই কাপড়ে নাকি কোরআন এর আয়াত লেখা। স্বাভাবিকভাবে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মনে আঘাত লাগল। অশান্তি ও ধরপাকড় চলল। একতরফাভাবে শুধু মুসলমানদের বিজেপি সরকারের পুলিশ গ্রেপ্তার করল। কারও কারও বাড়ী গুঁড়িয়ে দেওয়া হল।যোগীরাজ্যের সেই বুলডোজার সংস্কৃতি।

এবার একটু দেখে নেওয়া যাক দুই নৃপতি কে কেমন ছিলেন।

একথা ঠিক ঔরঙ্গজেব একজন ধর্মপ্রাণ রক্ষনশীল গোঁড়া সুন্নি মুসলমান ছিলেন। নিজহস্তে কোরান কপি করতেন, টুপি সেলাই করতেন। এসব আমরা ছোটবেলায় ইতিহাস বইতে পড়েছি। তবে তিনি লম্পট বা খুব অত্যাচারী শাসক ছিলেন বলে অন্তত জানা নেই। তবে সেসময় সব রাজা বা সম্রাট সকলেই তা সে হিন্দু হোক বা মুসলমান তারা সবাই কমবেশী নিজের সাম্রাজ্য বাড়াতে তৎপর ছিলেন ও তারা গণতন্ত্রের ছায়াও মারাতেন না।

ঔরঙ্গজেবের সম্পর্কে যা জানা যায় তা হল তিনি মহারাষ্ট্রে জিজিয়া কর চাপিয়েছিলেন। একাংশের হিন্দুদের ওপর এই কর বসানো হয়। কিন্তু রাজপুত রাজাদের রাজত্বের মধ্যে তিনি জিজিয়া কর চাপান নি।এছাড়া দুই ধর্মের মানুষকেই তিনি মোটামুটি সমদৃষ্টিতেই দেখতেন। তিনি অসংখ্য মন্দির ধ্বংস করেছেন বলে যা বলা হয় তা নিছকই এক ভিত্তিহীন প্রচার।বরং তিনি হিন্দু মন্দির নির্মাণে নিষ্কর জমিদান ও অর্থ জুগিয়েছেন এমন বহু উদাহরণ আছে। আমি নিজে রামায়ন প্রসিদ্ধ চিত্রকূটে গিয়ে দেখেছি বাদশা আওরঙ্গজেবের দানে নির্মিত রামানন্দ সম্প্রদায়ের বিষ্ণু মন্দির। বাদশা ওই মন্দিরের নিত্য খরচ নির্বাহের জন্য ৩২ টি গ্রামে নিষ্কর জমিদান করেছিলেন। সেই আদেশনামা বা ফরমান এখনও সেখানে সযত্নে সংরক্ষিত আছে। গুয়াহাটির বিখ্যাত কামরূপ কামাখ্যা মন্দিরের জন্যও আলমগীর বাদশা (আওরঙ্গজেব) নিস্কর জমি দান করেছিলেন।

বাদশা সম্পর্কে অভিযোগ তিনি নাকি বহু হিন্দুকে ধর্মান্তরিত করেছিলেন।এটিও একটি সর্বৈব অসত্য প্রচার। যদি এই প্রচার সত্যিই হবে তাহলে এই প্রশ্ন ওঠা অত্যন্ত স্বাভাবিক যে সেক্ষেত্রে বাদশাহর রাজধানী ও ক্ষমতার কেন্দ্র দিল্লী ও আগ্রা'র পার্শ্ববর্তী উত্তর প্রদেশ , হিমাচল প্রদেশ , হরিয়ানা কি করে বিপুল হিন্দু সংখ্যা গরিষ্ঠ স্থান হিসেবে থেকে গেল?

আবার সেখান থেকে কয়েক হাজার কিমি দূরের অঞ্চল পূর্ব বাংলায় মুসলীম জনসংখ্যা এতটা হল কি করে? উচ্চবর্ণের অবিচার,জমিদারের অত্যাচার এই অঞ্চলে ইসলামের প্রসারের অন্যতম কারণ। স্বামী বিবেকানন্দ বলেছেন ' বঙ্গদেশে ইসলাম ধর্মের প্রসারের কারণ হিন্দুধর্মের বর্ণাশ্রম প্রথা ও জমিদারদের অত্যাচারের মধ্যে নিহিত।'

তবে একথা অনস্বীকার্য যে ঔরঙ্গজেবের সাম্রাজ্য বিস্তারের বিশেষ প্রবণতা ছিল নেপোলিয়নের মতো।তাই তাঁকে মৃত্যুবরণ করতে হয় দিল্লী থেকে অনেক দূরে দাক্ষিণাত্যে। যদিও ছত্রপতি শিবাজীর উত্থান তাঁকে মহারাষ্ট্র দেশে কঠিন চ্যালেঞ্জের মুখে ফেলেছিল।কিন্তু তার ওপর তিনি বিজাপুর ও গোলকুন্ডা এই দুই শিয়া মুসলমান নবাবের রাজ্য দখল করতে গিয়ে তাদের সঙ্গে যুদ্ধে জড়িয়ে পড়েন। এর সুযোগ গ্রহণ করেন শিবাজী। সম্রাট বৃদ্ধ বয়স পর্যন্ত যুদ্ধ করতে থাকলেন।জীবনের শেষ ২৫ বছর সময়কাল তাকে দাক্ষিনাত্যে কাটাতে হয়। ইতিহাসে একে আওরঙ্গজেবের Deccan Alcer বা ' দাক্ষিণাত্য ক্ষত ' বলা হয়। ঐতিহাসিক অড্রে ট্রাশকে 'আওরঙ্গজেব, দ্য ম্যান অ্যান্ড দি মিথ' গ্রন্থে লিখেছেন যে আওরঙ্গজেব শক্তিশালী রাজপরিবারের উত্তরাধিকার, যুদ্ধের ময়দানে অতুলনীয়,নীতি নির্ধারণে তার প্রপিতামহ আকবরের প্রভাব ছিল। তিনি সবধরনের মানুষকে গুরুত্ব দিয়ে দেখেছিলেন। পুরো সাম্রাজ্য তিনি নিজে ঘুরেছেন।বোঝার চেষ্টা করেছেন। মারাঠা থেকে রাজপুত সবার সঙ্গে তিনি যোগাযোগ গড়ে তুলেছেন ও রাজসভায় ধর্ম নির্বিশেষে গুরুত্বপূর্ণ পদে বসিয়েছিলেন।

যদুনাথ সরকারের 'এ শর্ট হিস্টরি ওব ঔরঙ্গজেব' গ্রন্থ থেকে পাওয়া যায় শম্ভাজি ঔরঙ্গজেবকে গালি দেয় ও নবীকে অপমানকর কথা বলে। ফলে ধর্মগুরুরা তাকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার পক্ষে রায় দেন।যদুনাথের মতে শম্ভাজিকে কখনওই ধর্ম পরিবর্তনের কথা বলা হয়নি। বরং শম্ভাজি কুমন্তব্য এবং সম্রাটের কন্যাকে ইঙ্গিত করে অশালীন মন্তব্য করেন। যদুনাথ ছাড়াও গোবিন্দ সারদেশাই বা রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতন ঐতিহাসিকেরা দেখিয়েছেন শিবাজীর উত্তরসুরি হিসাবে শম্ভাজি ছিলেন অপদার্থ ও অযোগ্য।

শম্ভাজি সম্পর্কে ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার

'শিবাজীর জ্যেষ্ঠপুত্র শম্ভুজী যেন পিতার পাপের ফল হইয়া জন্মিয়াছিলেন। এই একুশ বৎসর বয়সেই তিনি উদ্ধত, খামখেয়ালি, নেশাখোর এবং লম্পট হইয়া পড়িয়াছেন। একজন সধবা ব্রাহ্মণীর ধর্ম নষ্ট করিবার ফলে ন্যায়পরায়ণ পিতার আদেশে তাঁহাকে পনহালা দুর্গে আবদ্ধ করিয়া রাখা হয়। সেখান হইতে শম্ভুজী নিজ স্ত্রী যেসু বাঈকে সঙ্গে লইয়া গোপনে পলাইয়া গিয়া দিলির খাঁর সহিত যোগ দিলেন (১৩ই ডিসেম্বর, ১৬৭৮)। শম্ভুজীকে পাইয়া দিলির খাঁর আহ্লাদ ধরে না। 'তিনি যেন ইতোমধ্যে সমস্ত দাক্ষিণাত্য জয় করিয়াছেন এরূপ উল্লাস করিতে লাগিলেন এবং বাদশাহকে এই পরম সুখবর দিলেন।' আওরংজীবের পক্ষ হইতে শম্ভুজীকে সাত হাজারী মন্সব, রাজা উপাধি এবং একটি হাতী দেওয়া হইল। তাহার পর দুজনে একসঙ্গে বিজাপুর দখল করিতে চলিলেন। কিছুদিন পর শম্ভুজি পুনরায় দিলির খাঁর শিবির ত্যাগ করে ৪ ডিসেম্বর , ১৬৭৯ তে পনহালা দুর্গে ফিরে আসেন। কিন্তু তাঁর চরিত্রের কোনও পরিবর্তন হয়নি। শিবাজী জানুয়ারি , ১৬৮০ তারিখে পনহালা দুর্গে আসেন।

'জ্যেষ্ঠপুত্রের চরিত্র ও বুদ্ধির কথা ভাবিয়া শিবাজী নিজ রাজ্য ও বংশের ভবিষ্যত সম্বন্ধে হতাশ হইলেন। তাঁহার নানা উপদেশ ও মিষ্ট কথায় কোন ফল হইল না। শিবাজী পুত্রকে নিজের বিশাল রাজ্যের সমস্ত মহাল দুর্গ ধনভাণ্ডার অশ্ব গজ ও সৈন্যদলের তালিকা দেখাইলেন এবং সৎ ও উচ্চমনা রাজা হইবার জন্য নানা উপদেশ দিলেন। শম্ভুজী পিতার কথা শুধু চুপ করিয়া শুনিয়া উত্তর দিলেন, 'আপনার যাহা ইচ্ছা তাহাই হউক।' শিবাজী স্পষ্টই বুঝিলেন তাহার মৃত্যুর পর শম্ভুজীর হাতে মহারাষ্ট্র রাজ্যের কি দশা হইবে। এই দুর্ভাবনা ও হতাশা তাঁহার আয়ু হ্রাস করিল। শম্ভুজীকে আবার পনহালা-দুর্গে বন্দী করিয়া রাখা হইল, এবং শিবাজী রায়গড়ে ফিরিয়া আসিলেন (ফেব্রুয়ারি ১৬৮০)। তাহার দিন ফুরাইয়া আসিয়াছে বুঝিয়া, শিবাজী তাড়াতাড়ি কনিষ্ঠ পুত্র দশ বৎসরের বালক রাজারামের উপবীত ও বিবাহ দিলেন (৭ই ও ১৫ই মার্চ)।'

'২৩ এ মার্চ শিবাজীর জ্বর ও রক্ত-আমাশয় দেখা দিল। বারো দিন পর্যন্ত পীড়ার কোন উপশম হইল না। ক্রমে সব আশা ফুরাইল। তিনিও নিজ দশা বুঝিয়া কর্মচারীদের ডাকিয়া শেষ উপদেশ দিলেন; ক্রন্দনশীল আত্মীয়স্বজন , প্রজা ও সেবকদের বলিলেন 'জীবাত্মা অবিনশ্বর , আমি সুখে , দুঃখে আবার ধরায় আসিব।'

অবশেষে চৈত্র পূর্ণিমার দিন (রবিবার ৪ঠা এপ্রিল, ১৬৮০) সকালে তাঁহার জ্ঞান লোপ হইল, তিনি যেনো ঘুমাইয়া পড়িলেন। দ্বিপ্রহরে তাহা অনন্ত নিদ্রায় পরিণত হইল। তখন তাঁহার বয়স ৫৩ বৎসরের ছয় দিন কম ছিল। (শিবাজী, লেখক : ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার, আশাবরী পৃষ্ঠা-১৫৮ ও ১৬৮-১৬৯। লেখকের বানানবিধি রক্ষা হয়েছে।)

যদুনাথের পুস্তক অনুযায়ী জানা যায় ১৬৮৪ সালে মারাঠাদের অনেকগুলো দূর্গ দখল করে মোঘলরা শম্ভাজির দুই স্ত্রী ও কন্যাসহ দুই ক্রীতদাসকে বাহাদুরগড় দূর্গে বন্দী করে।বস্তুত ১৬৮৩ সালে গোয়া আক্রমণে ব্যর্থ হওয়ার পর শম্ভাজি ডুবে গিয়েছিলেন আমোদ প্রমোদ ও নারীর মধ্যে। তিনি শুধু সফল হয়েছিলেন নিজের বিমাতা, বৈমাত্রেয় ভাই ও পিতার মন্ত্রীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে। তার অপদার্থতার জন্যই শিবাজীর তৈরী সাম্রাজ্য চলে গিয়েছিল মোঘলদের দখলে। ঔরঙ্গজেব শম্ভাজিকে পরাস্ত ও হত্যা করার পর আগ্রা ফোর্টে শিবাজীর নাতি সাহু ছত্রপতি ও তাঁর মাকে (শম্ভাজির প্রথম স্ত্রীকে) থাকতে ও নির্বিঘ্নে ধর্মাচরণের সুযোগ দিয়েছিলেনা। পরবর্তীকালে ঔরঙ্গজেবের বড়ছেলে প্রথম বাহাদুর শাহ (১৭০৭ -- ১৭১২), সাহুকে তাঁর মাতাসহ তাদের রাজ্যে ফেরত পাঠায়।

যদুনাথ সরকারের 'ফল ওব মোঘল এম্পায়ার' অনুযায়ী মারাঠিরা কুখ্যাত ছিল এলাকা অধিকার করে গণধর্ষন করতে। বাধা দিলে সৈন্যরা হত্যা ও স্তনচ্ছেদ করতো মহিলাদের। নিজ রাজ্যে স্বধর্মের মানুষ ও বিমাতা ও তাদের সন্তান ও পিতার বিশ্বস্ত রাজকর্মচারীদের প্রতিও নিষ্ঠুরতা দেখিয়েছেন শম্ভাজি।

একথা ভুলে গেলে চলবে না শিবাজীর বাহিনীতে অনেক মুসলমান যেমন ছিলেন তেমনি ঔরঙ্গজেবের বাহিনীতেও অনেক

হিন্দু বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন। শিবাজীর গোলন্দাজ বাহিনীর প্রধান ইব্রাহিম আলি,অশ্বারোহী বাহিনীর প্রধান শামা খান, নৌ বাহিনীর প্রধান দৌলত খাঁ। যেমন ঔরঙ্গজেবের প্রধান সেনাপতি ছিলেন মীর্জা রাজা জয়সিংহ। অর্থমন্ত্রী ছিলেন রাজা রঘুনাথ সিং,এছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ দায়িত্বে ছিলেন যশোবন্ত সিং ইত্যাদি। সুতরাং এদের দুজনের সংঘাত বা সংঘর্ষ আদৌ হিন্দু-মুসলমান সংঘর্ষ ছিলনা। এই সংঘর্ষ ছিল দুই সামন্ততান্ত্রিক নৃপতির সংঘাত। শিবাজী কখনও মুসলমানদের ধ্বংস করার কোন চেষ্টা করেননি।

বর্তমানে যে বিবাদ ও অশান্তি সৃষ্টি করা হল তা নিছক একটা সমাধিস্থলের ওপর আক্রমণ হিসাবে না দেখে , দেখতে হবে একটা ধর্মনিরপেক্ষ দেশ থেকে কিভাবে প্রতিনিয়ত একটি সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সবসময় ভয় দেখিয়ে তাদের পদানত করে রাখার চেষ্টা সরকার করে চলেছে সেই পরিপ্রেক্ষিতে। এই সমাধিক্ষেত্রটি উক্ত অ্যাজেন্ডার একটি অংশমাত্র। তাছাড়া ঔরঙ্গজেবের শাসনপ্রনালী ইতিহাসের বিষয় হতে পারে, গবেষণাও হতে পারে কিন্তু একবিংশ শতাধীর জীবনযাত্রার প্রশ্ন হতে পারে কি? ইতিহাসকে অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার করে দেশে বসবাসকারী সংখ্যালঘুদের বিপদ সৃষ্টি করা। তাদের মনে ভয় ঢুকিয়ে দেওয়া। স্বাভাবিকভাবে এইসব সাম্প্রদায়িক উস্কানি দেওয়া হলে সংঘাত অনিবার্য। এই সুযোগে সংঘাত দমনের নামে আবার দক্ষিণপন্থী রাষ্ট্রযন্ত্র সংখ্যালঘুদের বিশেষকরে একটি নির্দিষ্ট সম্প্রদায় অর্থাৎ মুসলমানদের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়বেই। গ্রেপ্তারি ও বুলডোজার দিয়ে তাদের বাড়ী ঘর ভেঙে দেওয়া থেকে রাষ্ট্রদ্রোহ মামলায় বিনা বিচারে অনির্দিষ্টকালের জন্য জেল,ওমর খালিদের মত।

ঔরঙ্গজেবকে টার্গেট করা সহজ,কারণ সে সংখ্যালঘু। হিন্দু রাজা অশোকের নাম ছিল চন্ডাশোক। রাজা হওয়ার পর প্রথম আট বছর তার নৃশংসতার জন্যই এই নাম হয়েছিল। রাজা বিম্বিসারকে তার পুত্র অজাতশত্রু একাধিকবার হত্যার চেষ্টা করেছিল।

আসলে দেশের নানাবিধ সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হওয়ায় মোদীর নেতৃত্বে বিজেপিকে বার বার ধর্মকে আশ্রয় করে ক্ষমতা দখল করতে হচ্ছে, আরএসএসের অ্যাজেন্ডা অনুযায়ী। বিশেষ করে লোকসভা নির্বাচনে এককভাবে সরকার গড়তে না পারার পর আরএসএস নির্ভরতা বেড়ে গেছে বিজেপির। তাই মিথ্যা প্রচারকে হাতিয়ার করতে হচ্ছে কখনও 'কাশ্মীর ফাইলস' বা 'কেরল স্টোরি' অথবা কখনও 'ছাওয়া' র মত সিনেমা বকলমে প্রযোজনা করে। অবধারিতভাবে ভিকি কৌশল এবার তার পুরষ্কার পাবে। মোদী সংসদে এই সিনেমাটি দেখবেন বলে জানানোর ফলে সিনেমাটির প্রচার এমনিতেই অনেকটা বেড়ে গিয়েছে। শহরের মাল্টিপ্লেক্স গুলিতে বেশ কিছুদিন নাগাড়ে চলছে ছবিটি। হিটলারের আমলে তার প্রচারমন্ত্রী গোয়েবলস একই কাজ করেছিল ১৯৩৪ সাল থেকে। 'ট্রায়াম্ফ অব দ্য উইল ' সিনেমাটিতে নাজিরা কত ভাল একটি দল ও হিটলার শাসক হিসাবে কত ভাল তার প্রচার করে। এইভাবে তাদের জনপ্রিয়তা বাড়ানো হয়েছিল। 'যুৎ সুই' ছবিটিতে ইহুদিদের ছোট করে দেখিয়ে তাদের প্রতি বিদ্বেষভাব তৈরী করা হয়েছিল। ইহুদিরা যে কত খারাপ তার মিথ্যা প্রচার করে জনগণের মনে তাদের একটা নোংরা ইমেজ তৈরী করে তাদের অপদস্থ করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। বিজেপির পূর্বপুরুষরা হিটলারের বিশেষ গুণগ্রাহী হিসাবে খ্যাত।হিন্দু মহাসভার নেতাদের লেখা বইগুলি তাদের সেই পরিচয় বহন করছে। করোনার সময় বিজেপি দিল্লীতে তবলীগ জামাতদের সম্মেলনের জন্য করোনা ছড়িয়েছে বলে প্রচার করে তাদের জনতার চোখে শত্রু বা ভিলেন তৈরী করার যাবতীয় প্রচার করেছিল। তাদের বিরুদ্ধে একাধিক মামলাও করা হয়েছিল। কিন্তু আদালত সেইসব অভিযোগ পত্রপাঠ খারিজ করে সরকারকে তীব্র ভৎর্সনা করেন। এক্ষেত্রেও একই ধারা দেখতে পাওয়া যাচ্ছে। সরকারের যাবতীয় ব্যর্থতা ঢাকতে বিজেপির নেতারা মোদীকে অবতার বলে প্রচার করতে শুরু করেছে।

২০১৮ সালে ওড়িশার নেতা প্রদীপ পুরোহিত বললেন মোদী পূর্বজন্মে ছত্রপতি শিবাজী ছিলেন। ২০২০ সালে জয় ভগবান গোয়েলের লেখা বই ' আজ কা শিবাজী নরেন্দ্র মোদী' এর প্রকাশ হল বিজেপির দলীয় কার্যালয় থেকে। যদিও প্রচন্ড সমালোচনার পর বিজেপি নেতৃত্ব এই বইটির সঙ্গে দলের কোন যোগ নেই বলে হাত ধুয়ে নিল।কিন্তু দলীয় কার্যালয় থেকে প্রকাশিত বইটি তাহলে কেন প্রকাশিত হল সেই প্রশ্নের কোন জবাব পাওয়া গেল না। মোদী শিবাজীর কাজ সম্পূর্ণ করবেন বলে প্রচার চলছে মহারাষ্ট্রে।

গত লোকসভা নির্বাচনের আগে খোদ মোদী বলে বসলেন যে তার বিশ্বাস বায়োলজিক্যাল ভাবে তার জন্ম হয় নি।অর্থাৎ তিনি তার জন্মদাত্রী মাতা পিতাকে অস্বীকার করলেন। বললেন ইশ্বর বিশেষ উদ্দেশ্যে তাকে পৃথিবীতে পাঠিয়েছে। মহারাষ্ট্রের বিজেপি নেতা অবধূত ওয়াঘ মোদীকে বিষ্ণুর অবতার বলে ঘোষণা করলেন।সম্বিত পাত্র ওড়িশার নির্বাচনের আগে বললেন জগন্নাথদেব মোদীর ভক্ত ছিলেন। মজার কথা মোদী তার প্রধানমন্ত্রীত্বর ১১ বছরে একটিবারও সাংবাদিকদের মুখোমুখি হননি।একটি আলাপচারিতা দেখেছিলাম, যেখানে চলচিত্রের অভিনেতা অক্ষয়কুমারের সঙ্গে বিভিন্ন ধরণের আম কি ভাবে খান তাই নিয়ে ইন্টারভিউ দিচ্ছেন। আর সাম্প্রতিককালে 'podcast ' বলে কি একটা দেখলাম যেখানে তিনি নিজের কথা বা ধারণা অক্লেশে বলে চলেছেন। দেশের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলোর ধারেকাছে না গিয়ে। আবার যে বিদেশী সাংবাদিক তার সামনে ছিল তিনি নাকি ৪৮ ঘন্টা উপবাস করেছিলেন এই পডকাস্ট নেওয়ার আগে।সাংবাদিকটি একবারও প্রশ্ন করলেন না মনিপুর হিংসা নিয়ে বা দেশের ক্রমবর্ধমান বেকারত্ব বা মূল্যবৃদ্ধি নিয়ে।

অধিকাংশ মানুষের ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞানতা ও স্বল্প জ্ঞানের সুযোগ নিয়ে হিন্দুত্ববাদী সাম্প্রদায়িক শক্তি ক্রমাগত ইতিহাসকে বিকৃত করছে , মানুষকে বিভ্রান্ত করছে ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন সৃষ্টি করে চলেছে। এর সঙ্গে আরও একটি উদ্দেশ্য নিজেদের লাগামহীন ব্যর্থতা ধামাচাপা দেওয়া। সকলে এখনও সতর্ক হন। নতুবা সামনে সমূহ বিপদ।

মহম্মদ আলি জিন্নাহ ও মহম্মদ ইউনূস

তসলিমা নাসরিন

ইউনুস সাহেব নাকি ঈদের নামাজ পড়েছেন ! নামাজ পড়তে জানেন তিনি? আমার তো মনে হয় না। তরুণ বয়স থেকেই তিনি আমেরিকায়, সেখানেই পড়াশোনা, সেখানেই চাকরি। ঠিক জিন্নাহর মতো। জিন্নাহ যেমন ব্রিটেনে পড়াশোনা করেছেন, ব্রিটেনেই চাকরি করেছেন। মদ আর শুয়োরের মাংসে অভ্যস্ত হয়েছেন। তেমন ইউনুসও। ফ্রান্সের দোভিলে আমরাতো এক টেবিলে বিখ্যাত ইউরোপেয়ানদের সঙ্গে লাঞ্চ করেছিলাম। তিনি তো সেই টেবিলে বসে আর সবার মতো ওয়াইন খেয়েছিলেন, শুয়োরের মাংস খেয়েছিলেন। তিনি তো নামাজ কী করে পড়ে জিন্নাহর মতোই জানেন না। কিন্তু জিন্নাহ যেমন মুসলমানদের জন্য পাকিস্তান চেয়েছিলেন, ইউনুসও তেমন মুসলমানদের জন্য আরেক পাকিস্তান চান। জিন্নাহ যেমন হিন্দু বিদ্বেষী, ভারত বিদ্বেষী, জামাতি জিহাদি জঙ্গিদের নেতা হয়েছিলেন। ইউনুসও তেমন হিন্দু বিদ্বেষী, ভারত বিদ্বেষী, জামাতি জিহাদি জঙ্গিদের নেতা হয়েছেন। জিন্নাহ ক্ষমতার স্বাদ পেতে চেয়েছিলেন পাকিস্তানের, কারণ জানতেন যক্ষা হয়েছে তাঁর, বেশিদিন বাঁচবেন না। ইউনুসও ক্ষমতার স্বাদ পেতে চেয়েছেন তাঁর নতুন ২৪'এর পাকিস্তানের, কারণ জানেন বয়স হয়েছে তাঁর, বেশিদিন বাঁচবেন না।

তবে আমার মনে হয় একটিই পার্থক্য ইউনুসের সঙ্গে জিন্নাহ'র মধ্যে। নেহরুর ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে দেশ ভাগ করা ভুল হয়েছে , জিন্নাহ তাঁর মৃত্যুর আগে বুঝেছিলেন। ইউনুস তাঁর মৃত্যুর আগে বুঝবেন না যে হাসিনার ওপর প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য জামাতি জিহাদি জঙ্গি নিয়ে ধ্বংসাত্মক খেলা তাঁর খেলাউচিত হয়নি। (fbথেকে সংগৃহীত।)

বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস

সুশান্ত দাশগুপ্ত

গত ২৬ মার্চ ছিল বাংলাদেশের স্বাধীনতা দিবস।

১৯৭১ সালের ২৫ মার্চ রাতেপাকিস্তানি সেনা বাহিনী ঢাকা শহরে নারকীয় হত্যাকান্ড শুরু করে। বঙ্গবন্ধু তাঁর ৩২ নম্বর ধানমন্ডির বাড়িথেকে ই.পি.আর এর মাধ্যমে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন ২৬ ভোর বেলায় চট্টগ্রাম বেতাব থেকে পুনরায় বঙ্গবন্ধুর ওই বাণীকে অনুসরণ করে স্বাধীনতা ঘোষণা করেন প্রথমে চট্টগ্রাম আওয়ামী লীগের নেতা মোহাম্মদ হানিফ এবং কিছুপরে মেজর জিয়াউর রহমান। এরপরের ঘটনাবলী সবারই জানাআছে। সারা বাংলাদেশে ৯ মাসে পাকিস্তানি সেনা বাহিনী ৩০ লক্ষ মানুষকে হত্যা করেছিল। ২ লক্ষাধিক মা ও বোনকে তারা ধর্ষণ করেছিল। যারা একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের বিরোধী ছিল , সেই সাম্প্রদায়িক পাকিস্তানপন্থী শক্তি এখন ক্ষমতায়। স্বাধীন বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর থেকেই এই পরাজিত সাম্প্রদায়িক শক্তি ইতিহাসের চাকাকে পিছনের দিকেঘোরানোরচেষ্টা করছে। ১৯৭৫ সালের নৃশংস ভাবে বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যার মাধ্যমে এই প্রচেষ্টা শুরু হয়। তারপর চার জাতীয় নেতাকে হত্যা। অসংখ্য মুক্তি যোদ্ধাকেও হত্যা করা হয়। বাংলাদেশে এই সাম্প্রদায়িক শক্তি কখনও পিছু হটছে , আবার কখনও অগ্রসর হচ্ছে। এই সাম্প্রদায়িক শক্তির পিছনে মার্কিন সাম্রাজ্যবাদের পরিপূর্ণ মদত আছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র Foreign Policy তে নিজেদের পরাজয় কখনও মেনে নেয় না। ৭১ এ তাদের অপমানজনক পরাজয় তারা ভোলেনি। এবার তারা বাংলাদেশকে ভালোই বাগে পেয়েছে। আর এটা সম্ভব হয়েছে ভারত সরকারের বিদেশ নীতির নিদারুণ ব্যর্থতা ও আওয়ামী লীগের দুর্নীতি ও আত্মসন্তুষ্টির জন্য ।

যাইহোক এখনও বাংলাদেশের বিরাট সংখ্যক মানুষ ১৯৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের স্মৃতিকে লালন করে। রাষ্ট্রক্ষমতা হাতে পেয়ে শতশত মূর্তি ও মুক্তিযুদ্ধের স্মারক ভাঙলেও বঙ্গবন্ধু ও মুক্তি যোদ্ধাদের এখনও কোটিকোটি মানুষ অন্তর থেকে শ্রদ্ধা করে। বাংলাদেশে এমন কোনও গ্রাম নেই যেখানে অন্তত একজন মুক্তিযোদ্ধার সমাধি নেই।

গত ২৬ মার্চঅনেক বাধা সত্ত্বেও সারা বাংলাদেশে স্বাধীনতা দিবস পালিত হয়েছে। ইউনূস সরকার ২৬ মার্চস্বাধীনতা দিবস পালন করেছে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের নামটি উচ্চারণ না করে। প্রধান উপদেষ্টার বাণীতে স্বাধীনতা ঘোষণার কথা আছে। কিন্তু সেই ঘোষণা কে করলেন , কোন পরিপ্রেক্ষিতে করলেন, কী ভাবে করলেন সে বিষয়ে বিন্দুমাত্র উল্লেখ নেই।

স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী চিঠি দিয়ে মহম্মদ ইউনূসকে শুভেচ্ছা জানিয়ে লিখেছেন 'এই দিনটি আমাদের দুই দেশের ইতিহাস ও ত্যাগের দলিল, যা আমাদের মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্কের ভিত তৈরী করেছে।' তিনি আরো লিখেছেন 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ সবসময় আমাদের সম্পর্কের পথপ্রদর্শক আলো।'

এই চিঠিটি ঢাকার ভারতীয় দূতাবাস প্রকাশ করেছে।

সকলেই জানেন বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে সহায়ক শক্তিরূপে ভারতের অনন্য সাধারণ ভূমিকার কথা। নরেন্দ্র মোদীও সেই কথাটি মনে করেছেন। স্বাধীন বাংলাদেশেরউত্থানেরপর ইন্দিরা গান্ধিবলেছিলেন 'এই জয় দ্বিজাতিতত্ত্বের পরাজয় ও ধর্ম নিরপেক্ষতার জয়। সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্র ভেঙ্গে গিয়ে উত্থান হল এক ভাষা ভিত্তিক রাষ্ট্রের।'

খুবই দুঃখের বিষয় ইসলামিক মৌলবাদী শক্তি সেই দেশেরশাসন ক্ষমতা দখল করেছে। মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে যা কিছু অর্জিত হয়েছিল সব কিছু ধ্বংস করছে।

ইউনূস সরকার কতটা পাষণ্ড তা আমরা দেখলাম আমাদের দুই বাংলার শ্রদ্ধেয় সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব সঞ্জিদা খাতুনের প্রয়াণের পর। এই সরকার তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে কোনও শোক প্রকাশ করেনি। এমনকি তাঁর মরদেহে সরকার কোনও পুষ্পার্ঘও অর্পণ করেনি। এখন ওই মৌলবাদীরা প্রচার করছে ইসলামী মতে তাঁর দাফন হয়নি। রবীন্দ্র সঙ্গীতগেয়ে তাঁর দেহ দান করা হয়েছে। এঁরা সব নাস্তিক ও বিধর্মী। বাংলাদেশে সাম্প্রদায়িক শক্তির বিরুদ্ধে ধর্মনিরপেক্ষ মানবতাবাদী শক্তি যে এক অত্যন্ত কঠিন লড়াই করছে এই সত্যটি এপার বাংলার মানুষদের অনুধাবন করতে হবে।

লালমনিরহাটে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল ভাঙার প্রতিবাদ উদীচীর অবিলম্বে পুনঃস্থাপনের দাবি

লালমনিরহাট শহরের বিডিআর রোডে শিশু পার্কের পাশে মুক্তিযুদ্ধ স্মৃতিস্মারক মঞ্চে স্থাপিত ম্যুরালের একাংশ জেলা প্রশাসনের নির্দেশে ভেঙে ফেলার তীব্র নিন্দা ও প্রতিবাদ জানিয়েছে বাংলাদেশ উদীচী শিল্পীগোষ্ঠী। এক বিবৃতিতে উদীচী কেন্দ্রীয় সংসদের সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক বলেন, মুক্তিযুদ্ধের বীরত্বপূর্ণ ইতিহাসের স্মারক ম্যুরালটি কোন ঘৃণ্য উদ্দেশ্যে ভাঙা হয়েছে তা তদন্ত করে বের করতে হবে।

বিবৃতিতে উদীচীর নেতৃবৃন্দ বলেন, ১৪০ ফুট দীর্ঘ ম্যুরালটিতে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, বঙ্গবন্ধুর ৭ মার্চের ভাষণ, মুক্তিযুদ্ধ, মুজিবনগর সরকার, ৭১-এর গণহত্যা, পাকিস্তানি বাহিনীর আত্মসমর্পণসহ জাতির গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা চিত্রিত ছিল, যাস্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলছিল। এই ম্যুরাল দেখে সাধারণ মানুষ তথা তরুণ প্রজন্ম মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস সম্পর্কে জানতেপারতো। এর আগে, মহান বিজয় দিবস ও মহান স্বাধীনতা দিবসেরআগে দুই দফা ম্যুরালটি ঢেকে রাখা হয়। তখন জেলা প্রশাসক দাবি করেছিলেন, চব্বিশের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়বলে এটি ঢেকেরাখা হয়েছে।

উদীচী পরিস্কারভাবে বলতে চায়, ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধ এবং ২০২৪ সালের ছাত্র-জনতার গণঅভ্যুত্থানের মূল চেতনা কোনভাবেই একে অপরের সাথে সাংঘর্ষিক নয়। ১৯৭১ সালেস্বাধীনতা পেলেও বৈষম্য থেকে মুক্তি না পাওয়ার কারণেই সাধারণ মানুষকে ১৯৯০ বা ২০২৪ সালের মতো বারবার রাজপথে আন্দোলন করতে হয়েছে, আত্মাহুতি দিতে হয়েছে। কিন্তু, ৭১ এবং ২৪ কে মুখোমুখি বা সাংঘর্ষিক অবস্থানে নেয়ার কথা বলে একটি অপশক্তি সচেতনভাবে সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে। এই অপচেষ্টা প্রতিহত করার আহ্বানও জানান উদীচীর নেতৃবৃন্দ।

লালমনিরহাটে জেলা প্রশাসনের নির্দেশে মুক্তিযুদ্ধের ম্যুরাল ভাঙার সাথে জড়িতদের অবিলম্বে শাস্তির আওতায় আনার দাবি জানান উদীচীর সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক। একই সাথে কাল বিলম্ব না করে ম্যুরালটি সংস্কার করে আগের অবস্থায় ফিরিয়ে নেয়ার দাবিও জানান উদীচীর নেতৃবৃন্দ।